দাম : দশ টাকা

ইসলামি সন্ত্রাসবাদ :
একই বিষাদে আবদ্ধ
ভারত ও ইজরায়েল
পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

বামপন্থীদের
ইতিহাসটাই
দেশদ্রোহিতার
পৃঃ ২২

৭০ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২১ আগস্ট ২০১৭।। ৪ ভাদ্র - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

বামপন্থা

মুখোশের আড়ালে দেশদ্রোহিতা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ২ সংখ্যা, ৪ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২১ আগস্ট - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক

▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১০

খোলা চিঠি : আর এস এস ভাগাও, দেশ বাঁচাও

▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

দেশপ্রেমের আড়ালে গান্ধী-নেহরুর ব্রিটিশভক্তি

▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

ইসলামি সন্ত্রাস : ভারত ও ইজরায়েলের জাতীয় জীবনে দুঃস্বপ্ন

▯ মানস ঘোষ ▯ ১৫

মোদী ক্ষমতায় আসার পর কেরলে কমিউনিস্ট 'গণতন্ত্রে' বলি ৬৫ স্বয়ংসেবক ▯ ১৭

আমাদের মাতৃভূমি

▯ শ্রী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর ▯ ১৯

কমিউনিস্টদের ইতিহাসটাই দেশদ্রোহিতার

▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ২২

'ভারত ছাড়ো'-সহ গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আর এস এস ▯ রাকেশ সিনহা ▯ ২৭

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এখন প্রায় বিশ্বজুড়ে

▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ৩৩

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : গান্ধী বনাম গান্ধী ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ **অঙ্গনা : ৩৪** ▯ **অন্যরকম : ৩৭** ▯ **সুস্বাস্থ্য : ৩৮** ▯ **চিত্রকথা, শব্দরূপ : ৩৯** ▯ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভগবানের দেশে হার্মাদ

পশ্চিমবঙ্গে বাম-আমলে কমিউনিস্ট হার্মাদদের হাতে যেমন বহু মানুষ নির্যাতিত, নিহত হয়েছে, তেমনই 'ভগবানের দেশ' কেরলে কমিউনিস্টদের টার্গেট জাতীয়তাবাদীরা, বিশেষত আর এস এস-বিজেপির নেতা-কর্মীরা। আগামী সংখ্যায় এটাই স্বস্তিকার আলোচ্য বিষয়।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— ১০ টাকা মাত্র।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

চীন ব্যর্থ হইবে

ভারত-ভুটান-চীনের ত্রিদেশীয় অঞ্চল ডোকা-লা লইয়া গত প্রায় দুইমাস ধরিয়া উত্তপ্ত ভারত-চীন সম্পর্ক। ডোকা-লা-য় চীনা সেনাবাহিনীর রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমশই অচলাবস্থা তৈরি হইতেছে। চীনের পিপলস্ লিবারেশন আর্মিকে প্রতিরোধ করিতে ভারত সংশ্লিষ্ট সীমান্তে সেনা মোতায়েন করিয়াছে। সেখান হইতে সেনা প্রত্যাহার না করিলে ভারতকে যুদ্ধের হুমকি দিয়াছে চীন। এই সীমান্ত সমস্যা সমাধানে সম্প্রতি ভারত-চীনের মেজর জেনারেলরা বৈঠকে বসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বৈঠকে কোনো সমাধানসূত্র পাওয়া যায় নাই। উদ্বেগের বিষয় হইল, চীন সড়ক নির্মাণের কাজ বজায় রাখিয়া এই সমস্যার সমাধান চাহিতেছে। বিতর্কিত অঞ্চলে চীনের সড়ক নির্মাণ লইয়াই ভারতের যেখানে মূল আপত্তি, সেই ক্ষেত্রে সমঝোতার নামে চীন তাহাই করিতে চায়। ডোকা-লা হইতে ভারত সেনা প্রত্যাহার না করিলে আলোচনায় বসিবে না বলিয়া চীন ইতিপূর্বে জানাইয়াছিল। যখন এই কথায় কোনো কাজ হয় নাই, তখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিতে শুরু করে চীন। চীনের সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশের বিদেশ মন্ত্রকও যেখানে অশিষ্ট ভাষা ব্যবহার করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ লাগাইতে শুরু করিয়াছে। তাহাতে শুধু ভারতের কাছে নহে, বিশ্বের দরবারেও তাহার আসল চেহারাটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। চীনের এই বারবার হুমকি এই কারণে যে, তাহাদের হুমকি সত্ত্বেও ভারত তাহার বক্তব্য অত্যন্ত সংযতভাবে রাখিয়াছে। দ্বিতীয়ত, চীনের অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইয়াছে। চীন প্রথমে স্বীকার করে নাই যে ডোকা-লা লইয়া ভুটানের সহিত তাহাদের বিবাদ রহিয়াছে। পরে এই মিথ্যা আড়াল করিতে গিয়া চীন আরও একটি মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছে। ডোকা-লা চীনের এলাকা বলিয়া ভুটান নাকি মানিয়া লইয়াছে। ভুটান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চীনের এই দাবির প্রতিবাদ করিয়াছে।

ভারত ডোকা-লা সীমান্তে নিজেদের সেনা সংখ্যা ক্রমশ কমাইতেছে অথবা সিকিমের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি হইতে বাসিন্দাদের সরাইয়া লইয়া যাইতেছে— চীনের এই দাবিও নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন। তিব্বতের ক্ষেত্রে চীন যেমন ম্যাকমোহন সীমারেখাকে অস্বীকার করিয়াছে, ডোকা-লা-র ক্ষেত্রেও ১৮৯০ সালে ব্রিটেনের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিও অস্বীকার করিতেছে। চীন যে আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যাখ্যা করিতে চায়, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মজার বিষয় হইল, চীন ১৮৯০ সালের চুক্তির উল্লেখ করিতেছে। কিন্তু ২০১২ সালে যে সমঝোতা হইয়াছিল সেই বিষয়ে নীরব রহিয়াছে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে চীন যে এইরকম দ্বিচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, সারা বিশ্ব তাহা প্রথম হইতেই লক্ষ্য করিতেছে। যেমন দক্ষিণ চীন সাগরের বিষয়ে চীন কোনো আন্তর্জাতিক নিয়মনীতির তোয়াক্কা করিতেছে না। বস্তুত চীন তাহার আচারণের জন্যই নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাইতেছে। সাম্প্রতিক বৈঠকের পর স্পষ্ট হইতেছে চীন সহজে নিজেদের দাবি হইতে পিছাইয়া যাইবে না। কিন্তু তাহাদের দাবি মানিয়া লওয়ারও কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভারতের অবস্থান মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চীন নিজের পাতা ফাঁদে নিজেই পড়িবে। এইজন্য ভারতীয় নেতৃত্বকে ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হইবে।

সুভাষিতম্

অগুণস্য হতং রূপং অশীলস্য হতং কুলম্।

অসিদ্ধেস্য হতা বিদ্যা অভোগস্য হতং ধনম্।। (চাণক্যনীতি)

গুণহীনের রূপ, অসচ্চরিত্রের কুল, সিদ্ধিহীনের বিদ্যা এবং ভোগহীনের ধন— এসবই বিনষ্ট বলে জানবে।

মুসলমানদের নিরাপত্তা নিয়ে আনসারির মন্তব্য

যোগ্য জবাব দিলেন ইন্দ্রেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। উপরাষ্ট্রপতির বিদায় মঞ্চকে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যবহার করেছিলেন বিদায়ী উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি। তাঁর বক্তব্য ছিল, এদেশে মুসলমানরা নাকি নিরাপদ নয়। আনসারির এই মন্তব্যের যোগ্য জবাব দিলেন রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চের মার্গদর্শক ইন্দ্রেশ কুমার। গত ১২ আগস্ট নাগপুরে রাখিবন্ধনের একটি কার্যক্রমের শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনসারিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের যে প্রান্তেই আনসারি যান না কেন, দেখবেন মুসলমানরা নিরাপদেই রয়েছেন। ইন্দ্রেশজী স্পষ্টই বলেছেন— 'আনসারি তাঁর এই বক্তব্যের প্রতি সমর্থন দেশের কোনো প্রান্ত থেকেই পাননি। এমনকী নিরপেক্ষ ও দেশপ্রেমী মুসলমানরাও তাঁর মতের বিপক্ষে গিয়েছেন। যে দশ বছর উপরাষ্ট্রপতির চেয়ারে তিনি ছিলেন ততদিন নিজেকে সেকুলার রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি একজন কট্টরপন্থী।'

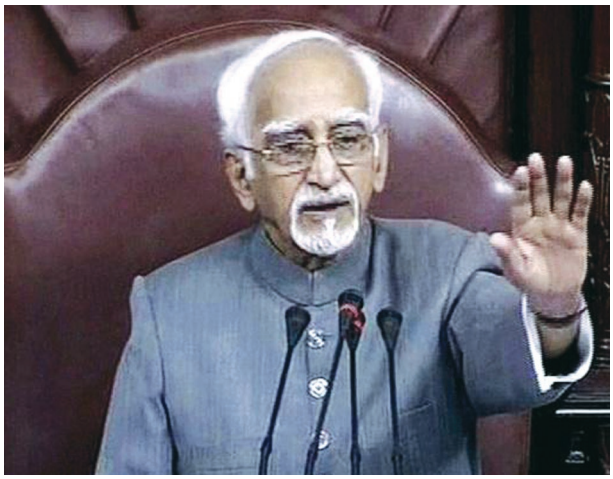

ইন্দ্রেশ কুমার আরও বলেন, 'হামিদ আনসারি একজন ভারতীয় ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সাম্প্রদায়িক। তিনি সমস্ত দলের নেতা ছিলেন, এখন তিনি একজন কংগ্রেসী। গত দশ বছরে তিনি একবারও নিজের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেননি।' দেশের রাজনৈতিক মহল অবশ্য মনে করেন, হামিদ আনসারি আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছেন এবং এতে কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্টদেরও মদত পেয়েছেন। ২০০৭ সালে তিনি উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার পর থেকে সাত বছর বিরোধী দলের ভূমিকায় থেকেছে বিজেপি। রাজ্যসভায় দেশের প্রধান বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে আনসারির। কিন্তু তাঁর পদের মর্যাদা রক্ষা করে বিরোধী থাকাকালীন, পরে ক্ষমতায় এসেও সৌজন্যের রাজনীতিই করেছে বিজেপি। যদিও বিদায়কালে আনসারি নিজে সেই পদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেননি। তবুও বিজেপি উপরাষ্ট্রপতি পদের মর্যাদা রক্ষা করে দলগতভাবে আনসারিকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু তাঁকে জবাব দেওয়ার কাজটি চলছে। বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু 'মুসলিমরা নিরাপদ' মন্তব্য করে আনসারিকে প্রাথমিক জবাবটা দিয়েছিলেন। এবার যোগ্য জবাব এল ইন্দ্রেশ কুমারের কাছ থেকে। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ইন্দ্রেশজী এও বলেন— 'মুসলমানরা তাঁর মতে পৃথিবীর কোন প্রান্তে নিরাপদ তা যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। আমার মনে হয় না যে আনসারি কোনো নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সুতরাং যে দেশে তিনি নিজেকে নিরাপদ ভাবেন, সেই দেশেই তাঁর চলে যাওয়া উচিত।'

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে আর এস এস মুসলমান বিরোধী বলে যে লাগাতার মিথ্যাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চ। তাঁরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক কারণে কংগ্রেস-কমিউনিস্টরা এদেশের মুসলমানদের পাকিস্তানের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয়তাবোধসম্পন্ন মুসলমানরা পাকিস্তানের বিরোধী। যে কারণে গত ৯ থেকে ১৪ আগস্ট মঞ্চের 'পাকিস্তান পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলন বিপুলভাবে সফল হয়েছে। বহু জায়গায় মুসলমানরাই পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে আর এস এসের কোনো অবদান নেই বলে কংগ্রেসীরা যে প্রচার চালাচ্ছে তারও মুখের মতো জবাব দিয়েছেন ইন্দ্রেশ কুমার। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতার আগে কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দলের নাম ছিল না। যেটা এখন হয়েছে। তখন কংগ্রেস ছিল একটি মঞ্চ, যারা স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করতো। সেই মঞ্চে আর এস এসও উপস্থিত ছিল। প্রকৃত পক্ষে সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা ডা. হেডগেওয়ার অনুশীল সমিতির পাশাপাশি কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। এবং স্কুলজীবনেই ইংরেজ ইন্সপেক্টরের সামনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়েছিলেন। এজন্য স্কুল থেকে তাঁকে বহিষ্কৃত হতে হয়। এভাবে কিশোর বয়স থেকেই তিনি দেশপ্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন তা অস্বীকারের সাহস কোনো অর্বাচীনই দেখাবে না।

অরুণাচলে সেনাকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ডোকা-লা-কে ঘিরে চীনের হুমকি ক্রমশ বাড়তে থাকায় অরুণাচলে ভারতীয় সেনাকে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যেখানে থাকার কথা সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে অবস্থান করছে ভারতীয় সেনা। যদিও ভারত-চীন সীমান্ত থেকে এখনও তারা অনেকটাই দূরে রয়েছে।

সূত্রের খবর, ডিমাপুর হেডকোয়ার্টারের তিন নং কোর এবং তেজপুর হেডকোয়ার্টারের ৪০ নং কোরকে হাই অ্যালার্ট পরিস্থিতির প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তিব্বতে অবস্থানরত চীনা বাহিনী এখনও এমন কিছু করেনি যা দেখে বলা যায় যুদ্ধ অনিবার্য। প্রাথমিক সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ভারতীয় সেনা এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্ব সীমান্তের রাজ্য সিকিমে ইতিমধ্যেই 'অপারেশনাল অ্যালার্ট' জারি করেছে সেনা। অক্টোবর থেকে এই রাজ্যে সেনা তৎপরতা আরও বাড়বে বলে জানা গেছে। ভারত-চীন সীমান্তের আর একটি বিতর্কিত অঞ্চল লাদাখে অবশ্য সেনা-তৎপরতার খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

এমাসের গোড়ায়, অরুণাচলে যখন ২৪০০০ সৈন্যকে তাদের অবস্থানবিন্দু থেকে এগিয়ে যেতে বলা হলো তখনই বোঝা গিয়েছিল উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যটির নিরপত্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে সেনাবাহিনী। যদিও চীন যাতে এই সুরক্ষাবলয়কে আগ্রাসন ভেবে ভুল না বোঝে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও ভারত বদ্ধপরিকর। মিলিটারি ট্রাকের কনভয় ছোট রাখা হয়েছে। এমনকী ৯০০০ ফুটের বেশি উচ্চতায় সেনাকে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাহিনী।

সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ভারতের গোলন্দাজ বাহিনী সীমান্তের ৭০-৮০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করছে। অন্যসময় সাধারণত বাহিনী ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। যুদ্ধ শুরু হলে পাহাড়ি রাস্তায় দ্রুত যাতায়াত কষ্টসাধ্য, তাই এই অগ্রগমন বলে জানানো হয়েছে। প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে বায়ুসেনাকেও।

এদিকে ডোকা-লা সীমান্তে চীনের আগ্রাসন, চীন-ভারত দুই দেশের সেনা মোতায়েন এবং তাই নিয়ে চীনের ক্রমাগত হুমকি দেওয়াকে 'বালখিল্যের আচরণ' বলে বর্ণনা করেছে আমেরিকা। এও বলা হয়েছে, ভারতের আচরণ প্রাপ্তবয়স্কের মতো। ভারতের প্রশংসা করে আমেরিকার নাভাল ওয়ার কলেজের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট সমর বিশেষজ্ঞ জেমস আর হোনস বলেন, এখনও পর্যন্ত ভারত যা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সবই ঠিক। এই বিরোধ জিইয়ে রাখার জন্য দিল্লি উস্কানি দিচ্ছে না, দিচ্ছে বেজিং। চীনের আচরণ বয়ঃসন্ধিতে পা দেওয়া বালখিল্যের মতো। তিনি আরও জানান, যুদ্ধ শুরু হলে দিল্লি অ্যাডভান্টেজ পাবে। কারণ, হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে চীনের থেকে ভারতের ভৌগোলিক সুবিধা অনেক বেশি। তাই ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে নামলে চীনকে বেশি দাম দিতে হবে।

স্বয়ংসেবক খুন, জমি হারানোর ভয়ে উন্মত্ত সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। যত দিন যাচ্ছে কেরলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জমি তত শক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে জমি হারাচ্ছে সিপিএম। তাই তারা উন্মত্তের মতো নেমে পড়েছে খুনোখুনির রাজনীতিতে। সাম্প্রতিক একটি ঘটনায় যার অব্যর্থ প্রমাণ মিলেছে।

সঙ্ঘের প্রচারক তিরিশ বছর বয়সী মনু মোহন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সিপিএমের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত কন্নুর জেলার সেয়িল থেকে কীভাবে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি গিয়েছিলেন রাখিবন্ধন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে। কিছুক্ষণ পরে সি পি এমের একদল কর্মী তাদের ঘিরে ধরে মারতে শুরু করে। প্রায় জনাপঞ্চাশেক স্বয়ংসেবক এবং অনুগামী বেধড়ক মার খায়। মোহন বলেন, আমার পূর্বপরিচিত একজন সিপিএম কর্মীর বাড়িতে আমি লুকিয়ে ছিলাম। মধ্যরাতে স্বয়ংসেবকরা আমাকে উদ্ধার করে। ভাগ্য ভালো এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গত কয়েক বছরে কেরলে সঙ্ঘের সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এতে রাজনৈতিক জমির হারানোর আশঙ্কা করছে সিপিএম। তাই এমন হার্মাদের মতো আচরণ। ওই আধিকারিকের বক্তব্য থেকে উঠে এসেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সাম্প্রতিক কেরলের থিয়া সম্প্রদায়ের ওপর সঙ্ঘের প্রভাব বেড়েছে। একসময় এই সম্প্রদায় সিপিএম ঘনিষ্ঠ ছিল। গত কয়েক বছরে সঙ্ঘের যত স্বয়ংসেবক সিপিএমের হাতে খুন হয়েছেন তাদের একটা বড় অংশ এই থিয়া সম্প্রদায়ের। এদিকে সঙ্ঘকে টেক্কা দিতে কয়েকবছর ধরে ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দেওয়ার রাজনীতি শুরু করেছে সিপিএম। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই অ-বামসুলভ আচরণের ফলে সিপিএম ক্রমশ রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে। বাড়ছে সঙ্ঘের জনপ্রিয়তা। তাই উপায়ান্তর না দেখে খুনোখুনির রাজনীতি করছে সিপিএম।

ঝাড়খণ্ডে ধর্মান্তরকরণ বিরোধী বিল পাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১২ আগস্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় ধর্মান্তরকরণ বিরোধী বিলটি পাশ হয়ে গেল। 'দি রিলিজিয়াস ফ্রিডম বিল -২০১৮' শীর্ষক বিলটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সভায় পেশ করে। বিরোধী দলের সদস্যরা বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানালেও তা খারিজ হয়ে যায়। বিলটি প্রথমে রাজ্যপাল ও পরে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। এই সম্মতি পেলে বিলটি আইনে পরিণত হবে। এই বিলে কাউকে ধর্মান্তরিত করা হলে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। শাস্তি হিসাবে তিন বছর জেল এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা এক সঙ্গে দুটোই। ধর্মান্তরিত যদি অল্পবয়স্ক, নারী, তপশিলি জাতি বা উপজাতিভুক্ত হয়, তবে শাস্তি বেড়ে হবে ১ লাখ টাকা, ৫ বছরের জেল অথবা দুই-ই। ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় ধর্ম পরিবর্তন করেছেন তা ডেপুটি কমিশনারকে জানাতে বাধ্য থাকবেন। যেমন ধর্মান্তরকরণের সময়, স্থান এবং যার

মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হয়েছে তার বিবরণ।

বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার সময় বিরোধী ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (জে এম এম)-র প্রবীণ বিধায়ক স্টিফেন মারান্ডি বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, ধর্মান্তরকরণের আগে ডেপুটি কমিশনারকে জানানো অপ্রীতিকর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বরং ওই ব্যক্তিকে এই পরিবর্তনের জন্য এফিডেভিট করতে বলা হোক। বিরোধী দলের নেতা তথা জে এম এম প্রধান হেমন্ত সোরেন বলেন, বিলটি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে তা নিয়ে আরও আলোচনা হওয়া দরকার।

বিজেপির চিফ হুইপ রাধাকৃষ্ণ কিশোর সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, গত দু'দশকে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে গেছে। ২০০১ সালে ঝাড়খণ্ডে খ্রিস্টান ধর্মভুক্ত মানুষ ছিল ১০, ৯৩,৩৮০। আর ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে তা বেড়ে হয়েছে ১৪, ১৮,৬০৮। অর্থাৎ খ্রিস্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩০ শতাংশ। তাঁর প্রশ্ন, এই ধর্মান্তরিত মানুষ কারা? এইসব মানুষেরা হলেন দরিদ্র, দলিত, দুর্গম এলাকার জনজাতিভুক্ত।

শ্রীকিশোরের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ধর্মান্তরিত হতে রাজি না হলে মিশনারিদের পরিচালিত স্কুল থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়। বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ওঁরাও বলেন, এই বিল হচ্ছে সনাতনধর্মী তথা প্রকৃতিধর্মীদের অন্তরাত্মার কণ্ঠস্বর। ঝাড়খণ্ড গঠিত হওয়ার পর তা শোনা দরকার।

প্রতিরক্ষা বিভাগের জমি বাঁচাতে বাবুল গাছের চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নিজেদের জমি রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা বিভাগ এক চমৎকার উপায় বের করেছে। উত্তরপ্রদেশে বেরিলি সেনানিবাসের ডিইও প্রমাদ সিংহ এই উপায় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। বেরিলি ও শাহারানপুর এলাকায় প্রতিরক্ষা বিভাগের শত শত একর জমি পড়ে রয়েছে। জমির দালাল ও দখলদারদের হাত থেকে নিজেদের জমি বাঁচাতে তিনি এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। গত জানুয়ারি মাসে এইসব জমিতে বাবুল গাছের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যা এখন গাছে পরিণত হয়েছে।

এরকম ফলাফল দেখে সেখানকার

জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) লে. জে. ললিত পাণ্ডে মীরাট, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ সার্কেলে এক নোটিশ জারি করেছেন, যাতে জমি বাঁচাতে বৃক্ষরোপণের ভাবনাটা কার্যকরী হয়।

এর ফলে প্রতিরক্ষা বিভাগের কোটি কোটি টাকা মূল্যের জমি রক্ষা পাবে। ডিইও বলেন, অল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে জমি দালালদের হাত থেকে জমি রক্ষা করা খুবই কঠিন। বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা বিষয়টি ব্যয়বহুল বলে এড়িয়ে যান। তখন বাবুল গাছের চারা বসাতে সিদ্ধান্ত নিই। বাবুল গাছের বীজের দাম বেশ সস্তা— এক কেজি বীজের দাম ১০০ টাকা। এক এক জমির জন্য এক কেজিই যথেষ্ট। এভাবে এখনও পর্যন্ত দুশো একর জমিতে বাবুল গাছের বীজ ছড়ানো হয়েছে।

প্রচ্ছদে অর্ধনগ্ন দুর্গা

পত্রিকার অফিসে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পুজোসংখ্যার প্রচ্ছদে অর্ধনগ্ন দুর্গামূর্তি ছাপার জন্য সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ্গ দলের পক্ষ থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পত্রিকার দপ্তরের কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়। ফলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে ২৫ জন মহিলাও ছিলেন। পরে সবাইকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এবারের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় মেরির কোলে গণেশের ছবি মুদ্রিত হয়েছে এবং ওই গোষ্ঠীর পত্রিকা পূজাবার্ষিকীর প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে অর্ধনগ্ন দুর্গামূর্তি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অভিযোগ, নকশালবাদ-মাওবাদের সমর্থকেরাই এখন আনন্দবাজারের ভাগ্যবিধাতা। ফলস্বরূপ কাশ্মীরে কোনো জঙ্গির মৃত্যু ঘটলে তা ছবিসহ আনন্দবাজারের প্রথম পাতায় ছাপা হয়। ইদানীং শুরু হয়েছে দেবদেবীদের নিয়ে টানাটানি। দেবী দুর্গা হিন্দুদের কাছে মা। তাঁকে নগ্ন করতেও তাদের বাধে না।

উবাচ

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে আমরা হতাশ। কমিশনার কেন্দ্রীয় বাহিনী চাননি বলেই ভোটে তৃণমূল সন্ত্রাস করতে পেরেছে। সঠিকভাবে জনমতের প্রতিফলন ঘটেনি।

দিলীপ ঘোষ
বিজেপি রাজ্য সভাপতি

সাতটি পুরসভার ভোটে তৃণমূলের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক। আশা করব শীঘ্র তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থান প্রসঙ্গে।

রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিক মুসলমানদের তা মেনে নেওয়া উচিত। এমনকী আদালতের রায় যদি মুসলমানদের পক্ষেও যায় তা হলেও তাদের উচিত বাবরির জমি হিন্দুদের ফেরত দেওয়া।

মৌলানা কালবে সাদিক
শিয়া সম্প্রদায়ের নেতা

রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সম্ভাব্য রায় প্রসঙ্গে।

এখনও পর্যন্ত ভারত যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সবই ঠিক। চীনই বরং বালখিল্যের মতো আচরণ করছে। মেজাজ হারাচ্ছে অল্পতেই।

জেমস্ আর হোমস
বিশিষ্ট সমর বিশেষজ্ঞ

ডোকা-লায় দুদেশের সেনা মোতায়েন প্রসঙ্গে।

বড় জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির কেউই কাশ্মীরে হামলা করার সাহস পাচ্ছে না। এর জন্য রাজ্যের পুলিশকর্মীদের ধন্যবাদ দিতে চাই।

অরুণ জেটলি
প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

জম্মু-কাশ্মীরের সন্ত্রাস প্রসঙ্গে।

জন্মলগ্ন থেকেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক

দেবব্রত চৌধুরী

গত ১৫ জুন আনন্দবাজার পত্রিকায় বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক মর্মস্পর্শী লেখার তারিফ না করে থাকতে পারছি না। তিনি লিখতে চেয়েছেন 'ধর্ম না দেখে বিপন্নের পাশে দাঁড়ানোর কথা'। তিনি লিখেছেন— আমাদের দেশে কোথাও কোনো মুসলমান অত্যাচারিত হলে প্রাজ্ঞ (?) হিন্দুরা বুক চিতিয়ে তার পাশে দাঁড়ান। একজন মানুষের জন্য আর এক জন মানুষের যেভাবে দাঁড়ানো উচিত সেইভাবেই। প্রাজ্ঞ হিন্দুরা কবে একজন অত্যাচারিত হিন্দুকেও মানুষ ভাবতে পারবেন? কবে বলতে পারবেন সতেরজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারা অন্যায় হয়েছিল। কবে আমরা ধুলাগড়, দেগঙ্গা কিংবা ক্যানিং-এর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারবো 'প্লিজ পানিশ আস অলসো উই হ্যাড ডিসাইডেড টু কল হেল্প এ হিন্দু'।

আসলে স্বাধীনতার সময় সব হিন্দু নেতাই, তিনি যে মতেরই হোন না কেন, কংগ্রেসের ছত্রতলে দাঁড়িয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু খেয়াল করেননি বা গুরুত্ব দেননি কংগ্রেসের সামনের সারির নেতারা ছিলেন আসলে সাম্প্রদায়িক। মোদ্দা কথা মুসলমান তোষণকারী। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মুসলিম লিগের মুখপত্র 'দৈনিক আজাদ'-এর সম্পাদক মৌলানা আক্রাম খাঁ আরব ভূখণ্ডকে মানুষের আদি মাতৃভূমি বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ ভারতবর্ষকে 'মা' বলে সম্বোধন বা যে 'বন্দেমাতরম্'-এ ভারতবাসী উজ্জীবিত হতো তাঁর কাছে তা ছিল ইসলামি বিরোধী। আজও এই দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটেনি।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ হলো অমুসলিম অপবিত্র দেশ। অতএব মাতৃভূমি নয়, স্বয়ং মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তান দাবির পক্ষে ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণার আগে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে লিখলেন, "Hindus and Muslims are two seperate nations with their different religious philosoply, social customs and litarature"। এই ভাবনাই পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কারণ, যা পরবর্তীকালে কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু মেনে নিয়ে ভারত বিভাগে রাজি হন। কিন্তু ভারতভাগের পর হিন্দুরা যেখানে সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরা যেখানে সংখ্যালঘু তাদের কী হবে? জিন্নার এব্যাপারে পরামর্শ হলো "Exchange of population and he advised both and Hindus and the Muslim to move to the respective areas where they were is a majority"। এক কথায় কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুরা বাংলা ও পাঞ্জাবকে পাকিস্তানকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। বাংলার বাঘ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গর্জে উঠলেন, সমগ্র বাংলাকে তিনি পাকিস্তানে যেতে দেবেন না। জওহরলালকে প্রতিবাদপত্র দিলেন। প্রত্যুত্তরে জওহরলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদকে লিখলেন, — বাংলায় মুসলিমরা সংখ্যাগুরু, তাই বাংলার পাকিস্তানে যাওয়া উচিত। উত্তরে শ্যামাপ্রসাদ লিখলেন— "If 25 percent Muslim could not agree to live in India now could 44 percent Hindu live in Bengal under 54 percent Muslim"।

এই দাপটেই আজকের পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি তা আজকের নেতারা শ্যামাপ্রসাদের এই মহান কীর্তি ভুলে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে অনেকে জিন্নাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। ভারত ভাগ না করে উভয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করে একটা সংবিধান তৈরি করা হোক। জিন্না তা সজোরে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ১৯ জুলাই ১৯৪৬ সালে "This day we bid goodbye to constitutional method now the line has come for the Muslim nation to resort direct action. I am not prepered to discuss ethies. We have a pistol and are in a position to use it"।

যে ধর্মসম্প্রদায়ের লোক যে দেশে বেশি তারা সেখানে চলে যাবেন দেশভাগের পর।' কিন্তু বাস্তবে কি মুসলমানরা পাকিস্তানে গেল? ওদিকে পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মেরে খুন করে মেয়েদের ইজ্জত লুটে সব ব্যাপারে হেনস্থা করে হিন্দুদের খণ্ডিত ভারতে যেতে বাধ্য করেছে। আর ভারতে থাকা মুসলমানরা কংগ্রেসী নেতাদের ভোটের লালিপপ্ দেখিয়ে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের ধারা বজায় রেখেছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কলমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'শক-হুনদল-পাঠান-মোঘল এক দেহে হল লীন'। কিন্তু পাঠান মুঘলরা কি এ দেশে ভারতবাসী হয়ে লীন হলেন? যদি হোতেন তবে পাকিস্তান সৃষ্টি হতো না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোধহয় পরবর্তীকালে বাস্তব বুঝে তার 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে (শ্রাবণ, ১৩৩৮) লিখেছিলেন, পলিটিক্সের ক্ষেত্রে বাইরে থেকে যেটুকু তালি দেওয়া মিল করা যায় সে মিল আমাদের চিরকাল টিকবে না... এমনকি পলিটিক্সের এ তালিটুকু থাকবে এমন আশা নেই। যেখানে গোড়ায় বিচ্ছেদ সেখানে তাগায় জল ঢেলে গাছকে চিরদিন তাজা রাখা অসম্ভব, মুসলিম নেতারা ভারত স্বাধীন হয়ে ভারতীয়দের দ্বারা শাসিত থেকে তা বিশ্বাস করতেন না। প্রাক স্বাধীন যুগে মুসলিম নেতা সৈয়দ শ্যামসুল হুদা তার প্রতিবেদনে একবার লিখলেন, "...India Muslim think they are Muslem first and India after wards"। হুদা সাহেব যিনি গভর্নরের এক্স কাউন্সিল-এর সদস্য ছিলেন তিনি লিখলেন ১৯১২ সালের অক্টোবরে, 'There is a distinction between patriotism of Hindu and Muslims. The patriotism of a Hindu consiste in his love for his country. Unfortuantely for the Mohamedans they still look upon India as their land of adoption. Their patriotism is extra territorial due to religious sectiment"। একথা কংগ্রেস আগে বোঝেনি আজও বুঝতে চাইছে না।

আর এস এস ভাগাও, দেশ বাঁচাও

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আকাশে, বাতাসে স্লোগান। মোদী হঠাও, বিজেপি হঠাও, আর এস এস হঠাও। না, স্লোগান নয়, কান্না। মুমূর্ষুর আর্তি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আর্তি। যা সর্বব্যাপী তাকে যে হঠানো যায় না সেই বোধও নেই।

তিন বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা দেশে ঝড় তুলে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি। এনডিএ-র শরিক দলগুলি ছাড়াই বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে এসেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে নতুন সরকারের দাপটে বিরোধী দলগুলি কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন থেকেই। তখন থেকেই পিছু হঠা শুরু হয়। এখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে।

অন্য দিকে মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার থাকায় দেশ জুড়ে হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিজয়রথ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের এক স্বয়ংসেবক দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেটা টের পেয়েছে দেশ একের পর এক পদক্ষেপে। দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত কাকে বলে টের পেয়েছে গোটা বিশ্ব। আর এখন বিরোধীরা দেখছে একা মোদীতেই রক্ষা নেই অনেক দোসর।

১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন নাগপুরে কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা করেন। একশো হতে এখনও আট বছর বাকি। জুলাই মাসের শেষে এক স্বয়ংসেবক রামনাথ কোবিন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে আসীন হয়েছেন। আর আগস্ট মাসে উপরাষ্ট্রপতি পদে আনুষ্ঠানিক ভাবে বসলেন বেঙ্কাইয়া নাইডু। আর এক স্বয়ংসেবক। হ্যাঁ, সেই স্বয়ংসেবক যাঁর খাকি হাফ প্যান্ট দেখে কমরেডরা গালাগাল দিতেন— 'হাফ গা***'।

কংগ্রেসিরা বলত গান্ধীজীর খুনি, বিদেশের চর আরও কত কী। হ্যাঁ, সেই খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা জামা, কালো টুপিই এখন দেশ চালাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসে সুশাসনের শিক্ষা দিচ্ছে গোটা দেশকে।

দেশের তিনটি সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। এমন গর্বের দিন, অহঙ্কারের দিন কম আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে আসেনি। অনেক আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে এসেছে এক আদর্শের শীর্ষ বিজয়। তিন স্বয়ংসেবক তো আসলে গৈরিক ধ্বজকে নিত্য প্রণাম করে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি তোলা এক দীর্ঘ সংস্কারের প্রতীক।

এর আগে দুই স্বয়ংসেবক অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী ও ভৈরোঁ সিংহ শেখাওয়াত উপরাষ্ট্রপতি হলেও রাষ্ট্রপতির পদে কোনও স্বয়ংসেবক বসতে পারেননি। সেই স্বপ্ন পূরণ করলেন রামনাথ কোবিন্দ। শুধু এই তিন পদেই নয়, এখন উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র— দেশের নানা প্রান্তে বেশিরভাগ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদেই কোনও স্বয়ংসেবক বা সঙ্ঘ-অনুগামী। হ্যাঁ, যাঁরা শাখার মাঠে হাফ প্যান্ট পরে দক্ষ-আরাম করতেন। দেশের ৭০ শতাংশের বেশি স্থানে, এমনকী রাজভবনেও এখন সঙ্ঘের বিচারধারার প্রতীক পৌঁছে গিয়েছে। আধিপত্য ১০০ শতাংশ হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

যাঁরা 'আর এস এস ভাগাও, দেশ বাঁচাও' বলে চিৎকার করছেন তাঁদের কাছে অনুরোধ, আগে এমন এক সংগঠনকে স্যালুট করুন। গোপনে হলেও করুন। তার পরে হিংসা করুন।

মনে রাখবেন, সত্য চিরকাল সত্য। কলি যুগে সঙ্ঘই শক্তি।

—সুন্দর মৌলিক

দেশপ্রেমের আড়ালে গান্ধী-নেহরুর ব্রিটিশভক্তি

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যখন ব্রিটেন জড়িয়ে পড়েছে, তখন দরকার ছিল তাকে একটা মর্মান্তিক আঘাত করা। কারণ শত্রুকে তার দুর্বলতম মুহূর্তেই জখম করতে হয়। যুদ্ধের আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র অজস্র জনসভায় এই কথা বলেছেন। হয়তো তাঁর মনে পড়েছিল স্বামীজীর কথা,— 'Hit the iron when it is hot।' তিনি জানতেন, 'Freedom can never be hold by begging. It has to be got by force. Its price is blood'— (সিলেকটেড স্পীচেস, পৃ. ১৩৯)। তাঁর মতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘটতে পারে— 'In British decline alone lies the hope of India's independence'—(ঐ, পৃ. ১৬৮)।

কিন্তু গান্ধী, নেহরু প্রমুখ নেতা চিরদিন নিয়েছেন আপোশ-নীতি, খুঁজেছেন সমঝোতার পথ। যখন জার্মান আক্রমণে ব্রিটেন প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, সারা দেশে উঠেছে অন্তিম লগ্নের হাহাকার— গান্ধীজী বলেছেন— 'I am not just now thinking of India's deliverance'— সেটা ব্রিটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নয়— (হরিজন, ২.৯.৩৯)। তাঁর আরও বক্তব্য ছিল— 'We dont see our independence out of Britain's ruin. This is not the way of non-violence।' বোঝা গেল— দেশের মুক্তির চেয়ে তাঁর কাছে অনেক বেশি দামি ছিল তাঁর অহিংসার মন্ত্র।

কংগ্রেসের মস্তিষ্কহীন তাত্ত্বিক নেতা নেহরু ছিলেন তাঁর মন্ত্রশিষ্য। তিনিও জানিয়েছিলেন, 'We do not approach the problem with a view to taking advantage of Britain's difficulties'— (দ্য স্টেট্স্ম্যান, ১০.৯.৩৯)। যেন ব্রিটেন তাঁর সুসময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দান করে হাসিমুখে বিদায় নেবে। তাঁর আরও বক্তব্য ছিল— ব্রিটেনের সেই সঙ্কটলগ্নে তাকে

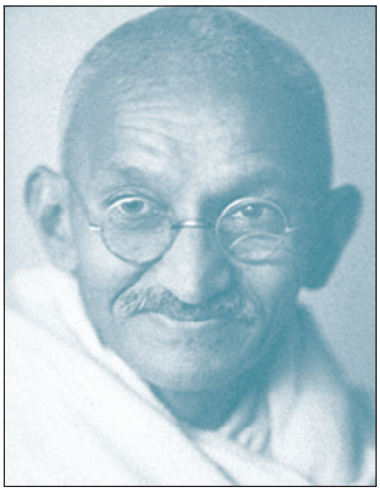

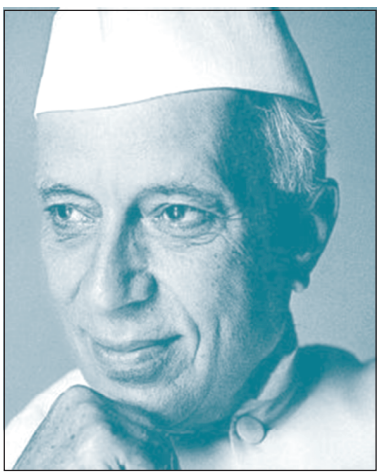

আঘাত করাটা আমাদের পক্ষে হবে অমর্যাদার ব্যাপার— ('would be one act derogatory to India's honour')।

শুধু তাই নয়, আগের বছর হরিপুরা-কংগ্রেসে তাঁদের দল প্রস্তাব নিয়েছিল— ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী নীতির কারণে যদি কোনও বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে ভারতবর্ষ কোনও ভাবেই তাকে সমর্থন বা সাহায্য করবে না। কিন্তু যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পর গান্ধী-নেহরু জানিয়েছেন— গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের সেই যুদ্ধে ভারতবর্ষ আছে গণতন্ত্রের (অর্থাৎ ব্রিটেন) পক্ষেই। গান্ধীজী বড়লাটকে নৈতিক সমর্থনের কথাও জানিয়ে এসেছেন। দরকার ছিল ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করা— কিন্তু গান্ধী-নেহরুরা তখন কেঁদে আকুল ব্রিটেনের বিপর্যয়ের কথা ভেবে।

অথচ প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ ই.এস. কার (Carr) তাঁর 'ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স বিটুইন টু ওয়ার্ল্ড্ ওয়ার্স' গ্রন্থে লিখেছেন, যুদ্ধটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের ছিল না, কারণ অগণতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার তলব গেছে মিত্রপক্ষের দিকে, আর জাপান ফ্যাসিবাদ গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমাদের মহান নেতারা তখন একটা সমঝোতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কিছুকাল পরে আট্লান্টিকের এক জায়গায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এক বৈঠকে পরাধীন দেশগুলোর মুক্তিদানে সাহায্যদানের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাতে আমাদের পূর্বোক্ত নেতারা আনন্দে অধীর হয়ে ব্রিটেনের প্রতি আরও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কিন্তু চার্চিল অবিলম্বে জানিয়েছেন যে, ঘোষণাটা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় (৯.৯.৩১)। ড. ডিসি গুপ্ত লিখেছেন, 'This created acute frustration and disappointment in India and the leader and people found themselves in a doleful situation'— (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ১৪০)।

তবু এই সব ভারতীয় নেতা তাঁদের নীতি বদল করেননি আশায়- আশায়। সুভাষচন্দ্র তখন মন্তব্য করেছেন, যে বুট তাঁদের লাথি মারে, তাতেই তাঁরা চুম্বন করেন। এইসব কারণে সঙ্গত প্রশ্ন তোলা যায়— পূর্বোক্ত নেতারা কি সত্যিই দেশপ্রেমিক ছিলেন? তাঁরা কি দেশের মুক্তি চেয়েছিলেন?

কিন্তু আমাদের নিবন্ধটা শুরু করা উচিত ছিল আরও আগে ১৯২৯ সাল থেকে। সেই বছর গান্ধীজী কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন— দল থেকে একচ্ছত্র নায়কের অভিধাও পেয়েছেন। তিনি এক সর্বভারতীয় সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন এবং প্রায় সমগ্র

ভারতবর্ষ তাতে উদ্বেল-উত্তাল হয়ে গিয়েছে। দেশের কোণে কোণেও দেখা গিয়েছে এক অভূতপূর্ব জাগরণ। মানুষ সব ভয়-ভীতি ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই মহাসংগ্রামে। এত বড় জন-আন্দোলন এই দেশে আগে কখনও ঘটেনি।

তাঁর হাতে ছিল তিনটে অস্ত্র--- 'অসহযোগ,' 'অহিংসা' ও 'সত্যাগ্রহ'। তাঁর মতে দেশের অনেকে সরকারের অত্যাচারের সহযোগী— তাই ছাড়তে হবে আদালত, সরকারি অফিস ও সরকারি স্কুল। এতেই সরকার দুর্বল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় মন্ত্র হলো 'অহিংসা'। তাঁর মতে, অন্য প্রাণীকে হিংসা মানায়— কিন্তু মানব-সমাজে হিংসার স্থান নেই— 'Non-violence is the law of our species, as violence is the law of the brute. It is also a social virtue'— (হরিজন, ৭.৯.৩৯)। সুতরাং সংগ্রাম করতে হবে অহিংস পদ্ধতিতে। তৃতীয়ত, সেটা হবে সত্যাগ্রহ। অর্থাৎ সত্যাশ্রিত। কিন্তু শুধু তাই নয়— সত্যাগ্রহে কেউ 'শত্রু' থাকতে পারে না--- থাকে 'প্রতিপক্ষ'। তার অত্যাচার সত্ত্বেও তার অমঙ্গল কামনা করা যাবে না, চাইতে হবে তার চিত্তশুদ্ধি।

কিছু উকিল পেশা ছেড়েছেন এবং কিছু অভিভাবক সরকারি স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা জনপ্রিয় হয়নি। তাছাড়া অহিংসার দ্বারা কোনও দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। আর দেশের বিদেশি শাসকদের অত্যাচার সহ্য করে তাদের মঙ্গল ও হৃদয়-পরিবর্তনের চিন্তা পাগলেও করে না।

সুতরাং বলা যায়— তাঁর তত্ত্ব না বুঝেই কিন্তু মুমুক্ষু ভারত তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। আবালবৃদ্ধ-বণিতা বিপুল উৎসাহে এসে দাঁড়িয়েছেন সংগ্রামের পুরোভাগে। বন্দির সংখ্যা ষাট হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফরাসি মনীষী রোমাঁ রোলাঁ লিখেছেন, 'The non-operation movement, however, gerw more and more powerful as time went on'— (মাহাত্মা গান্ধী, পৃ. ১৩৮)।

কিন্তু হঠাৎ প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটেছে। উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরায় পুলিশ নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে কার্তুজ ফুরোনোয় একটা ঘরে আশ্রয় নিলে ক্রুদ্ধ জনতা বাইশ জনকে পুড়িয়ে মারে। এই ধরনের ক্রিয়ায় এমন প্রতিক্রিয়া ঘটতেই পারে। তাছাড়া এটা ছিল বিশাল দেশের এক বিক্ষিপ্ত ঘটনা। অথচ গান্ধীজী ঘাবড়ে গিয়ে এত বড় আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। ঈশ্বর নাকি বলেছেন, এভাবে দেশবাসীকে সংগ্রামে নামানোটা ছিল একটা 'Himalayan blunder।' তাঁর এই হঠকারী সিদ্ধান্তে সারা দেশে হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল। তরুণ সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, সেটা ছিল একটা জাতীয় বিপর্যয় ('national calamity')। নেহরু বিবৃতি দিয়েছেন— যদি পুলিশ ছদ্মবেশী সেজে বোমা মারে, তাহলেও আন্দোলন বন্ধ করতে হবে?

ঐতিহাসিক ড. তারাচাঁদ মন্তব্য করেছেন, গান্ধীজীর ওই সিদ্ধান্ত একটা বিভ্রান্তি ও জটিলতার সৃষ্টি করেছিল— ('way bound to create confusion'— ('দ্য স্টোরি অব দ্য ফার্স্ট আন্‌আর্মড্ রিভোল্ট', ১৯২৯, পৃ. ৩২) কিন্তু আরও স্পষ্ট করে ড. নিমাইসাধন বসু লিখেছেন, 'disappointment'--- (দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভ্‌মেন্ট, পৃ. ৮১)। সৃষ্টি হয়েছিল দেশব্যাপী হতাশা। এভাবেই শেষ হয়েছে সেই সংগ্রাম।

গান্ধীজী আবার সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন আট বছর পরে— ১৯৩০ সালে। এবারে 'আইন অমান্য আন্দোলন।' সেটা আগের সংগ্রামকেও ছাপিয়ে গিয়েছে— সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে জন বিদ্রোহ, নানা ধরনের আইন ভঙ্গের ঘটনা দেশকে অগ্নিগর্ভ করে তুলেছে। দেখতে দেখতে বন্দির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে লক্ষাধিক। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 'his dandi-march created a terrible excitement all over the country and the people started it to strengthen the movement by breaking the laws in various ways'— (হিস্ট্রি অব মডার্ন বেঙ্গল, ২য়, খণ্ড, পৃ. ৩০০)। কিন্তু আবার ঘটেছে আশার অপমৃত্যু। হঠাৎ গান্ধীজী বড়লাট আরউইনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, থেমে গিয়েছে আন্দোলন। কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবীরা মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু অন্যরা নয়। আর ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। চাপে পড়ে একবার গান্ধী তাঁদের ফাঁসি রদ করার কথা তুলেছেন, কিন্তু বড়লাট রাজি হননি— (লর্ড আরউইন-ফুলনেস অব ডেজ, পৃ.১৪৯)।

গান্ধীজীর এই আকস্মিক আন্দোলন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত দেশে আবার এক গভীর হতাশার সঞ্চার করেছিল। সুভাষচন্দ্র তো বটেই, নেহরুও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন— (ড. এস. এন. সেন--- হিস্ট্রি অব দ্য ফ্রিডম-মুভমেন্ট ইন্ ইন্ডিয়া, পৃ. ২২২)। ওই বৈঠকের শর্ত হিসেবে গান্ধীজী লন্ডনের

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। সেখানে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য বিরাট জটিলতার সৃষ্টি করেছে। তাঁকে চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হয়েছে। শূন্য হাতে তিনি ফিরতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শুরু হয়েছে নারকীয় দমননীতি যাকে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বিলেতের পার্লামেন্টের সব দেখে ('ডেলিগেশান রিপোর্ট)— 'পুলিশ-রাজ' বলে একটা কথা তাঁরা আগে শুনেছিলেন, এবার বুঝেছেন— সেটা কী। এভাবে ব্যর্থ হয়েছে সেই আন্দোলন।

তৃতীয়বার গান্ধীজী আন্দোলন ডেকেছেন ১৯৪০ সালে মহাযুদ্ধের সময়। আগেই বলেছি— কংগ্রেস তখন সরকারকে সমর্থন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, যদিও কর্তৃপক্ষ নেতাদের লেজে খেলিয়েছে। নেহরু প্রমুখ নেতারা চেয়েছেন শর্তসাপেক্ষে সমর্থন, কিন্তু গান্ধীজীর প্রস্তাব ছিল— সেটা হবে নিঃশর্ত সমর্থন— 'whatever support was to be given to the British should be given unconditionally'— ভিনসেন্ট্ সীয়াল— মহাত্মা গান্ধী, পৃ. ১৫৩)। কিন্তু সরকার কংগ্রেসকে পাত্তা না দিয়ে মুসলিম লিগকে দোসর বানিয়েছে।

বাধ্য হয়ে গান্ধীজী 'ব্যক্তি-সত্যাগ্রহের ডাক' দিয়েছেন— একজন করে সত্যাগ্রহী রাস্তায় নেমে যুদ্ধ-বিরোধী শ্লোগান দিয়ে গ্রেপ্তার বরণ করবেন। আসলে, গান্ধীজী সরকারকে আদৌ বিব্রত করতে চাননি— (দে-চন্দ্র-ত্রিপাঠী— ফ্রিডম স্ট্রাগ্‌ল্, পৃ. ২১৩)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বোঝানো যে, কংগ্রেস কিছু একটা করছে। বলা বাহুল্য, এটা কোনো আন্দোলনই ছিল না— এতে তেমন কোনও সাড়াও পড়েনি।

তবে ১৯৪২ সালে তিনি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, জানিয়েছেন— আর সমঝোতার কোনও সুযোগ নেই। ক্রিপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হওয়ার পর নাকি তাঁর মনে এই পরিবর্তন এসেছিল— 'The failure of the Cripps Mission brought about a distinct change in Gandhiji's mood'— (ড. পি. এন. চোপরা— ইন্ডিয়া'জ স্ট্রাগল্ ফর ফ্রিডম, পৃ. ৫৭)।

তিনি ডাক দিয়েছেন— 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'— করবো নয়তো মরব। কিন্তু মৌলানা আজাদের 'ইন্ডিয়া উইন্স্ ফ্রিডম' পড়লে বোঝা যায়— আদৌ তিনি চূড়ান্ত সংগ্রাম চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল যুদ্ধ-বিব্রত সরকার সমঝোতা করবেই। সুতরাং সংগ্রাম করতেই হবে না বা সেটা শুরু করলে বড় জোর দিন-চৌদ্দ সেটা চালাতে হবে— সেটা হবে 'fourteen days' anarchy।'

তাই একদিকে তিনি সবাইকে বলেছেন নিজেদের স্বাধীন বলে ভাবার জন্য, আবার অন্য দিকে বলেছেন, অহিংসাকে আঁকড়ে থাকতেই হবে। নেহরু এটাকে 'open rebellion' বলায় বড়লাট ক্ষেপে গিয়েছিলেন— গান্ধীজী মীরা বেন্‌কে পাঠিয়েছেন তাঁকে ঠাণ্ডা করার জন্য। তাঁর বক্তব্য ছিল— সেটা তাঁর কথা নয়, তিনি সব সময় শান্তিবাদী।

কিন্তু তিনি শান্তিবাদী হলেও তাঁর সেই আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়েছিল— (ড. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়— স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক আপোশমুখী আন্দোলন, পৃ. ১২৩)। তাঁর দীর্ঘকালের শিক্ষা ভুলে দেশবাসী সরকারের চণ্ডনীতির বদলা হিসেবে ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নিয়েছিলেন। সারা দেশে শুরু হয়েছিল অদ্ভুত এক তাণ্ডব। সরকারের দমননীতিতে নিহত হয়েছিলেন হাজার দশেক মানুষ। ড. চোপরার মতে, এটা ছিল 'the biggest fight for freedom'— (কুইট্ ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, পৃ. ৯০)। কিন্তু সেটা গান্ধীজীর অভিপ্রেত ছিল না— তিনি পরে এই সংগ্রামের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছেন। অথচ ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, সেটা ছিল একটা 'গণ-অভ্যুত্থান'— (ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ২৫৩)। সুভাষচন্দ্র এমন একটা সংগ্রাম শুরু করার জন্য বারবার গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি দেশে থাকতে গান্ধীজী তা করেননি। আর ক্রুদ্ধ-উদ্ধত ভারতবর্ষ যখন সেই রক্তাক্ত-আগ্নেয় সংগ্রামের মাধ্যমে মুক্তিক্ষণকে এগিয়ে এনেছেন, তিনি তখন তার দায় নিতে অস্বীকার করেছেন। অথচ সেটা দেশের সংগ্রামে এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। এটাই বোঝা গিয়েছে যে, দেশবাসী আর পদানত থাকতে চাননি— ব্রিটিশশক্তিকে বিদায় নিতেই হবে— (ড. সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়— ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্রমবিকাশ, পৃ. ৩৯৯)। তাহলে গান্ধীজী ও তার শিষ্যরা কি সত্যিই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন?' নেতারা দেশবাসীকে পথনির্দেশ দেন বলেই জানি। কিন্তু আমাদের দেশবাসী ছিলেন এগিয়ে, অনেক পেছনে ছিলেন এই সব নেতা।■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

ইসলামি সন্ত্রাস : ভারত ও ইজরায়েলের জাতীয় জীবনে দুঃস্বপ্ন

মানস ঘোষ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফর ভারতের পরিবর্তনশীল বিদেশনীতির এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে। কারণ ভারত স্বাধীন হবার পর এই প্রথম কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল গেলেন সরকারি সফরে। মোদীর তিন দিনের ইজরায়েল সফর নানান দিক থেকে খুবই সফল ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইজরায়েল সফর করে তিনি শুধু ভারতের বিদেশনীতির পুনর্নির্ধারণ করে এক নতুন ব্যাখ্যাই দেননি, এই দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের এক নতুন দিক নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু দু' দেশের মানুষ ইসলামি সন্ত্রাসের শিকার, যাতে তাদের হাজার হাজার মানুষ বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে, সেই অভিন্ন বিষাদকে দুটি দেশ যৌথভাবে কী করে মোকাবিলা করবে তার জন্য তাদের সরকার একে অপরকে সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। ইসলামি সন্ত্রাস ভারত ও ইজরায়েলের জাতীয় জীবনে দুঃস্বপ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে। যার প্রতিকারের জন্য তারা জোটবদ্ধ হয়ে ইসলামি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামি সন্ত্রাসের সঙ্গে যুঝতে গেলে কী ধরনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সহযোগিতার প্রয়োজন তা তারা হাতে কলমে কাজ করে দেখাচ্ছে।

ইজরায়েলের ব্যাপারে ভারতের নীতি বদলের ঘটনা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভারতের প্রধান শাসকদল হিসেবে বিজেপির ইজরায়েল সম্পর্কে অবস্থান জেরুজালেমের শাসকদের খুব ভালো করেই জানা। ভারতের সনাতন জাতীয়তাবাদী বিদেশনীতির মূল প্রবক্তা দামোদর সাভারকর ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে নৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছিলেন। জওহরলাল নেহরুর নির্দেশে ভারত ইজরায়েলের রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হওয়ার যে

মোদী ও নেতানেয়াহু

তীব্র বিরোধিতা করে তার তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রী গোলওয়ালকর তো প্রকাশ্যে ইহুদি জাতীয়তাবাদের কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন প্যালেস্টাইন ইহুদিদের নিজস্ব স্বাভাবিক ভূখণ্ড। তাদের জাতিসত্তা ও রাষ্ট্রসত্তার ব্যাকুল বাসনাকে পূরক পদ্ধতি বলে বিশ্বাস করতেন এবং প্রকাশ্যে বলতেন ইহুদিদের নিজস্ব ভূখণ্ডের দাবি অযৌক্তিক বা অসম্ভব নয়।

কিন্তু নেহরু ধর্মের ভিত্তিতে ইজরায়েলের স্থাপনার চরম বিরোধিতা করেন এই কারণ দেখিয়ে যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাও মুসলমান জাতিসত্তার ভিত্তিতে হয়েছিল। ইজরায়েলের স্থাপনের বিরোধিতা নেহরু করেছিলেন তার অন্য এক কারণও ছিল। আরব ও মুসলমান বিশ্বকে খুশি করা। অন্য আরও একটি কারণ ছিল— ভারতের মুসলমান সমাজকে তোষণ করা— যাতে এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সব ভোট কংগ্রেসের বাক্সে পড়ে। নেহরুর আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ইহুদি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করলে মুসলমান দুনিয়া কাশ্মীর নিয়ে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করবে। পাকিস্তানকে নয়া এই সব অজুহাত দেখিয়েও নেহরু ইজরায়েলকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেননি । স্বীকৃতি দিয়েছিলেন প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পি এল ও)। ১৯৫০-এ ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও ভারত ইহুদি রাষ্ট্রকে দিল্লিতে দূতাবাস খুলতে দেয়নি। মুম্বইয়ে ছোটো একটি কনস্যুলেট খোলার অনুমতি দেয় মাত্র।

নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু অনেক বেশি বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি ১৯৫০-র পাক-ভারত যুদ্ধে মুসলমান দুনিয়ার পাকিস্তানের প্রতি সমর্থনে খুবই ক্ষুব্ধ হন। ১৯৬৮-তে ভারতের বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW) যখন স্থাপিত হয় তখন তিনি ওই সংস্থার প্রধান আর এন কাও-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন ভারতের জাতীয় স্বার্থে ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদের' সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে। রাজীব গান্ধীও 'র'কে ইজরায়েলের ওই গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে 'গোপন অপারেশনের' পরামর্শ দেন। ১৯৯২ সালে আমাদের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাও ইজরায়েলের সঙ্গে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলমান বিশ্ব ভারতকে পদে পদে অপদস্থ ও বিরোধিতা করায় নরসিমা রাও বুঝেছিলেন মুসলমানদের তোয়াজ করে চললে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা ও স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। তাই সব সময় ভারত ইজরায়েলকে স্বাভাবিক ভাবেই নিজের

'স্ট্রাটেজিক' মিত্র হিসেবে গণ্য করে আসছে। কিন্তু ভারত-ইজরায়েলের সম্পর্ক যে আরও নিগূঢ় এবং নিবিড় হয়েছে সেই কৃতিত্বটা যথার্থ ভাবে মোদীর প্রাপ্য। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ২০০৬-এ ইজরায়েল সফর করেন। গুজরাট যে আজ দেশের মধ্যে সবদিক থেকে উন্নয়নশীল রাজ্যে পরিণত হয়েছে তাতে ইজরায়েলের এক বিশেষ অবদান আছে। ইজরায়েলের বিভিন্ন কোম্পানি ও সরকার গুজরাটে বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। বিশেষ করে শিল্প, কৃষি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিভিন্ন ধরনের সেচ ব্যবস্থা, জলাধার প্রকল্প, হিরে ব্যবসা ও নদী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে। রাজস্থানের থর মরুভূমিতে ইজরায়েল ২০০৮-এ ১২০০টি জলপাইয়ের গাছ লাগায় এবং এক বছরের মধ্যে ১০০ টন জলপাই উৎপাদন করে। আজ রাজস্থানের মরুভূমির এক বিশাল অংশ জুড়ে জলপাইয়ের চাষ হয় যা রাজস্থানের কৃষি ব্যবস্থাকে দারুণভাবে চাঙ্গা করেছে। রাজস্থানের দেখাদেখি গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের অনুর্বর জমিতেও বড় আকারে জলপাই চাষ শুরু হয়েছে।

ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি যে অনেকটা ইজরায়েলের প্রযুক্তিতে নিহিত এটা নরেন্দ্র মোদী অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। আর ইজরায়েল যে ভারতের পরীক্ষিত মিত্র তার প্রমাণ ওই দেশটি বারে বারে দিয়েছে। ১৯৬৫, ১৯৭১-এ ভারত পাক যুদ্ধে এবং ১৯৯৯ কারগিল যুদ্ধের সময় ওই দেশটি যুদ্ধের নানান সরঞ্জাম দিয়ে ভারতকে সাহায্য করেছে। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় ভারত যখন দ্বিতীয়বার পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটায় তখন প্রায় সারা বিশ্ব ভারতের চরম বিরোধিতা করলেও ইজরায়েল ভারতের পরমাণু কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। ২০০৮-এ মুম্বই হামলার সময় ইজরায়েল ৪০ সদস্যের এক বিশেষ কমান্ডো বাহিনী পাঠাতে চায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সেই প্রস্তাব নাকচ করেন। ২০০৯-এ ইজরায়েলের বিদেশ দপ্তরের এক অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় প্রকাশ পায় যে ভারত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যার জনগণ ইজরায়েলের প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদি ও সহানুভূতিশীল।

ইজরায়েলের প্রযুক্তি শুধু ভারতের সামরিক বাহিনীর আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে যে এক বিশাল অবদান রেখেছে তাই নয়, আমাদের পানীয় জলের জোগান ও উৎস কীভাবে বাড়ানো যায় তার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে। ইজরায়েল সম্বন্ধে যে ভাবে ভারত সরকারের ও ভারতীয় জনসাধারণের উপলব্ধির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সেটাকে মান্যতা দিতেই নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েল সফরের সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ইজরায়েলকে নিয়ে ছুতমার্গের সংস্কৃতি চলে আসছিল তার অবসান ঘটাতে মোদী খুবই ব্যগ্র ছিলেন। তিনি জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা জমানার ওই ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার নীতি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে ওই দেশটিকে আরও কাছে টানার লক্ষ্যে ইজরায়েল সফরের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বদলের পেছনে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ভিত্তি আছে। সেটি হলো হিন্দু ও ইহুদি সমাজের মধ্যে দীর্ঘ আড়াই হাজার বছরের মধুর সম্পর্ক ও যোগসূত্র। এই দুই সমাজ এক অনন্য ঐতিহ্যের সাক্ষী। সেই আবহমানকাল থেকে দু'দেশের মানুষের মধ্যে কী ধরনের সৌভ্রাতৃত্ববোধ কাজ করছে এবং হিন্দুদের মহানুভবতা যে কতটা খাঁটি তা নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েল সফরের সময় ইহুদি ধর্মযাজকদের মুখ থেকে বার বার শুনেছেন। এক 'রাব্বাই' তো প্রকাশ্যে বলে ফেলেন 'ভারত পৃথিবীর মধ্যে বিরল থেকে বিরলতম দেশ যেখানে আমার সম্প্রদায়ের মানুষরা ২০০০-এর বেশি বছর বসবাস করেও কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ বা নির্যাতনের শিকার হয়নি। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অনন্য নিদর্শন।' এখন তো হিন্দু ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষ এতটাই কাছাকাছি এসেছে যে তারা প্রতি বছর দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্মেলন তাদের দেশে করছে।

মোদীর ইজরায়েল সফরের মূলে যে চালিকাশক্তি কাজ করেছে তা হলো গুজরাটের উন্নয়নে ইহুদি রাষ্ট্রটির অসামান্য ভূমিকা এবং তা যাতে ভারতের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয় তা নিশ্চিত করতে তাঁর এই সাহসী সিদ্ধান্ত। তড়িঘড়ি তাঁর সঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহুর যে ব্যক্তিগত রসায়ন গড়ে উঠেছে তার প্রতিফলন ঘটে এই সময়ে। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যে বিরাট সাফল্য পায় তার জন্য নেতানিয়াহু বিদেশি প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে প্রথম যিনি টেলিফোন করে মোদীকে অভিনন্দিত করেন। মোদী প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, তিনি 'দু' দেশের ও তার মানুষের মধ্যে বিরাজিত সম্পর্ককে আরও গভীর ও জোরদার করবেন।'

মোদীর সফরকালে দু'দেশের মধ্যে যে সাতটি চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলো তাদের সম্পর্ককে আক্ষরিক অর্থে আরও উচ্চাসনে স্থাপিত করতে চলেছে। এশিয়ায় চীনের পর ভারত ইজরায়েলের দ্বিতীয় বৃহৎ বাণিজ্যের অংশীদার। দু'দেশের বাণিজ্যের আয়তন ছয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাপিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চালু হলে তার আয়তন আরও তিন গুণেরও বেশি হবে। ইতিমধ্যে রাশিয়ার পর ইজরায়েল হলো ভারতের প্রতিরক্ষা সাজসরঞ্জামের দ্বিতীয় বৃহত্তম জোগানদার। দু'দেশের বাণিজ্য 'ওয়ানওয়ে'ট্র্যাফিকের মতো নয়। ইজরায়েল ভারতে কারখানা স্থাপন করে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে নানান প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য শিল্পের সাজসরঞ্জাম বানাচ্ছে। ভারতের হিরা ব্যবসায় ইজরায়েলি কোম্পানিরা বিশাল বিনিয়োগ করেছে। ভারত এক মহাকাশযানে ইজরায়েলের এক সামরিক কৃত্রিম উপগ্রহ 'টেকসরি'কে মহাকাশে পাঠিয়েছে। গত জানুয়ারিতে ভারত ও ইজরায়েল যৌথভাবে এক বিশাল অর্থ ভাণ্ডার স্থাপন করেছে যার উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তিগতভাবে দু'দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা। ভারতের আইটি কোম্পানিগুলো ইজরায়েলের 'স্টার্ট আপ' কোম্পানিতে প্রচুর বিনিয়োগ করছে। এই যৌথ উদ্যোগ ভারত ও ইজরায়েলের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে যে এক নতুন মাত্রা দেবে তা বলা নিষ্প্রোয়জন। ■

মোদী ক্ষমতায় আসার পর কেরলে কমিউনিস্ট 'গণতন্ত্রে' বলি ৬৫ স্বয়ংসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সিপিএমের শাসনও তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ওপর বামেদের মাত্রাছাড়া অত্যাচারে আর এস এসের সাংগঠনিক জোর অনেকটা কমই ছিল, অন্তত সিপিএমকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো ছিল না। এই পরিস্থিতিতেও বুদ্ধদেবের মুখে হুমকি শুনেছিল রাজ্যবাসী যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগাতে গেলে দু-চার পিস আর এস এসের লোকের মাথা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব। এরপর তসলিমা বিতাড়ন কেন্দ্র করে, নন্দীগ্রামের জমি বেআইনিভাবে দখল করায় বহু দাঙ্গা দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ, যার প্রতিটিরই মুখ্য কারিগর ছিলেন সেদিনের হুমকিদাতা। আর এস এসের লোকেদের মাথা আর তাঁকে গুঁড়োতে হয়নি, রাজ্যবাসী তাঁর মাথা কেটে দিয়েছেন। নেহাত কমিউনিস্ট হলে লজ্জা শরম থাকতে নেই তাই মাঝে মধ্যে গলাবাজি শোনা যায়। কিন্তু সে গলার জোর এতই কম যে প্রতিবেশী তো দূরে থাক, পাশে বসা লোকের কানেও যায় না।

কমিউনিস্টদের হাতে খুন সঙ্ঘ-কার্যকর্তা রাজেশ।

বুদ্ধবাবুর জেঠ্‌তুতো খুড়তুতো ভাইয়েরা কেরলে রয়েছেন। তারা তাঁর অপূর্ণ সাধপূরণ করেছেন, স্বয়ংসেবকদের রক্তে কেরলের মাটিকে রঞ্জিত করে। বাংলার জনগণ কুলোর বাতাস দিয়ে অত্যাচারী কমিউনিস্টদের বিতাড়ন করেছেন, ত্রিপুরায় মানিক-রক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কেরলকে মুক্ত করতে পারলে দেশটা বাঁচবে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির পদচিহ্ন কেরল বিধানসভায় পড়েছে। তাই কমিউনিস্টরা অশনি সংকেত দেখেছে। অতএব স্বয়ংসেবকদের ওপর আক্রমণ হান যত পার। কিন্তু এরা ভুলে যাচ্ছে বুদ্ধবাবুদের হাল হতে আর বেশি দেরি নেই।

আর এস এসের স্বয়ংসেবকদের ওপর কমিউনিস্টদের এই হামলা নতুন কিছু নয়। গত কয়েক বছর ধরেই চলছে। রাজেশ এদাভাকোড় নামে এক স্বয়ংসেবককে নির্মমভাবে হত্যার পর সারা দেশেই নিন্দার ঝড় ওঠে। অবশ্যই এই ঝড় জাতীয়তাবোধ, মানবতাবোধ সম্পন্ন মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কমিউনিস্ট 'বুদ্ধিজীবীরা' মানবতাবাদের মুখোশ পরে থাকেন। সামান্য তর্ক-বিতর্ক দেখলে, কিংবা যুক্তিতে এঁটে উঠতে না পারলে এঁরা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ দেখেন। হিন্দুধর্মের পবিত্র চিহ্নকে কেউ কন্ডোম দিয়ে ঢেকে দিলে এঁরা যারপরনাই উল্লসিত হয়ে ওঠেন। এটা তাঁদের কাছে মত-প্রকাশের স্বাধীনতা। অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলে তিনি হয়ে যান সাম্প্রদায়িক। ভারত থেকে অকস্মাৎ গণতন্ত্র হারিয়ে যায়, ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যায় আরও কত কী।

সম্প্রতি রাজেশের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিউনিস্টদের তুলোধনা করেন। এরপরেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী রাজেশের বাড়িতে গিয়ে স্পষ্টই বলেন, যেভাবে তাঁকে মারা হয়েছে তাতে জঙ্গিরাও লজ্জা পাবে। তিনি এও বলেন, এই ঘটনা দেশের অন্যপ্রান্তে ঘটলে এতক্ষণে পুরস্কার ফেরানোর ধুম পড়ে যেত। কিন্তু স্বয়ংসেবকের মৃত্যু তো, এর নিন্দে করতে নেই। সেটা প্রগতিবাদ বিরোধী। কমিউনিস্টদের এই খেলা দেশের মানুষ ধরে ফেলেছেন। তাই জাতীয় রাজনীতিতে তাঁদের অস্তিত্ব আজ শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপেও ধরা পড়ে না।

এরপরেও নির্লজ্জতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি একটি সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন যে আর এস এসের আক্রমণে তাঁদের দলের ১৩ জন নাকি মারা গেছেন, এখনও পর্যন্ত। এবছরে। আর একথা শুনে কেরলবাসী বলছেন--- 'আস্তে কন কত্তা, ঘোড়ায় হাসবো।' কারণ কেরলের কমিউনিস্ট সরকারের পুলিশই বলছে এবছরে চারজন বামপন্থীর মৃত্যু হয়েছে, অন্যদিকে ১০ জন আর এস এস কর্মী-সমর্থক মারা গিয়েছেন সিপিএমের হামলায়। যে ৪ জন কমিউনিস্টদের মৃত্যু হয়েছে, তাতে কারোর ক্ষেত্রেই আর এস এস বা বিজেপির যোগ প্রমাণিত নয়। এমনকী পারিবারিক বিবাদে মৃত্যুকে আদালতে রাজনৈতিক বিবাদে মৃত্যু বলে চালানো হচ্ছে, কেরল পুলিশের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘের হিন্দুত্বের দর্শন এধরনের হত্যার চরম বিরোধী ও একে ঘৃণাও করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক হত্যা ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধের ছায়াতেই লালিত পালিত কমিউনিজমের বলি হয়েছেন প্রায় ৬৫ জন স্বয়ংসেবক। ২০১৪-য় কেন্দ্রে বিজেপি আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এই তথ্য। দেশজুড়ে যতই ফ্যাসিবাদী শক্তি আত্মপ্রকাশ করুক গে, কেরলে কিন্তু গণতন্ত্রের পীঠস্থান। তাই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মুখে 'রা'টি নেই। কিন্তু তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, কেরল চীন বা পাকিস্তানে নয়, ভারতবর্ষে অবস্থিত। সেখানেও কুলোর বাতাস বইবে, অচিরেই।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

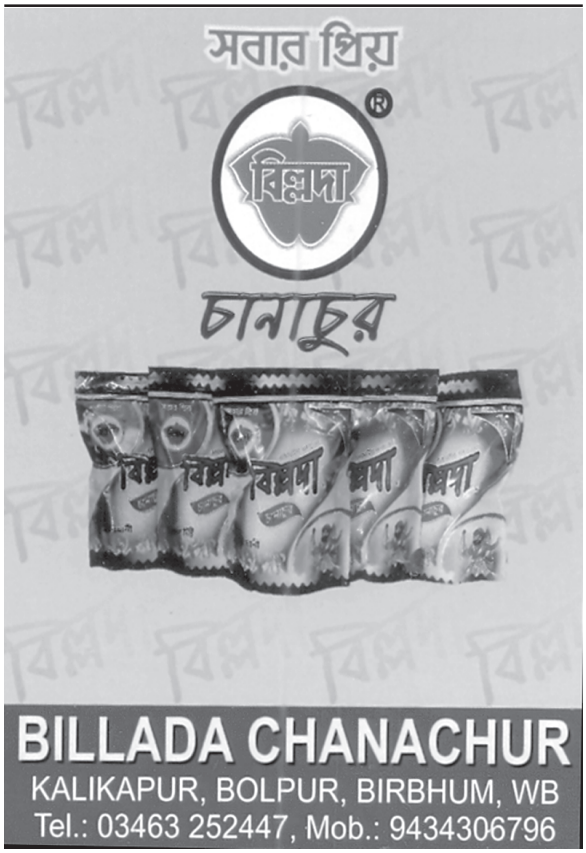

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

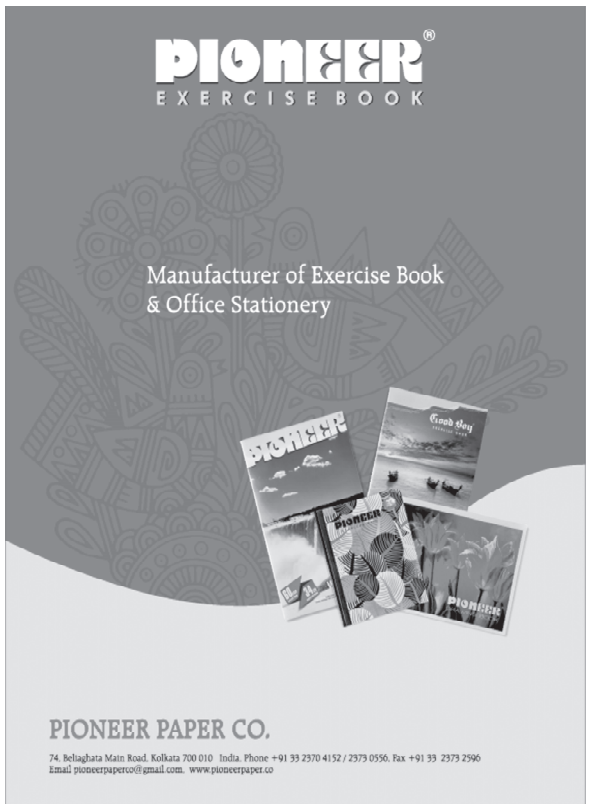

আমাদের মাতৃভূমি

শ্রী মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর

আমাদের দেশে অনেক অতি-বিশিষ্ট প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন যাঁরা সবজান্তার ভাব দেখিয়ে বলে থাকেন, 'মাতৃভূমি বস্তুটা আবার কী, এ তো শুধু পাথর আর মাটি!' এই ধরনের ব্যক্তিরা মনে করেন, বুদ্ধিটাই সব। তাঁদের বুদ্ধিগত যুক্তি অনুসারে, দেশটা হলো নিষ্প্রাণ। জড় ভূখণ্ড মাত্র। কিন্তু এই বুদ্ধিগত যুক্তিতর্কেরও তো একটা সীমা আছে। যেমন, মানুষের দেহ জড় বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। যে-কোনও মহিলার দেহের মতো মায়ের দেহও তো সমান জড়। তবে কেন অপর মহিলাদের থেকে নিজের মাকে আলাদাভাবে দেখা উচিত? তাঁর প্রতি ভক্তিই বা থাকবে কেন? তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর কোনও উত্তর নেই।

মাতৃ-ভাবনার বিকাশ

মনুষ্য-জীবন বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বের ভাব আরও ব্যাপক ও অধিকতর মহত্তর রূপ নেয়। মানুষ যখন তার বিচার বুদ্ধি নিয়ে চারপাশে তাকায় তখন আরও অনেক জিনিস তার নজরে আসে যে সবের প্রতি সে কৃতজ্ঞতায় ঋণী। সেইসব বস্তুকেও সে মাতৃরূপে দেখতে শুরু করে। নদীগুলির দিকে তার নজর যায়, যে নদী তাকে যোগায় খাদ্য ও জল। নদীকে তখন সে মা ডাকতে শুরু করে। মাতৃদুগ্ধ পানের অবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর তার চোখের সামনে থাকে গাভী, যে তার দুধ দিয়ে সারাজীবন তাকে প্রতিপালন করে। সে তখন তাকে গোমাতা বলতে শুরু করে। তারপর সে এই উপলব্ধিতে পৌঁছয় যে এই মাটিই তাকে পালন করে, তাকে রক্ষা করে এবং তার মৃত্যুর পরেও তাকে নিজের বুকে তুলে নেয়। তার চৈতন্যোদয় হয়— এই তো আমার সবচেয়ে বড় মা! সুতরাং কারও জন্মভূমিকে মাতৃরূপে দেখার মধ্যে মানবিক বিবর্তনের এক উচ্চস্তরেরই লক্ষণ প্রকাশ পায়। বেদ বলেছে : মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহম্ পৃথিব্যাঃ। (পৃথিবী আমার মা, আমি তার পুত্র)

চাই সক্রিয় ভক্তি

অতএব আমাদের দেশের প্রতি ওই অতি বিকশিত দৈবী মাতৃভাবকে দীপ্ত রাখা আমাদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। কিন্তু কেমন করে তার প্রতি আমাদের ভক্তিভাব প্রকাশ করব? দু'টি উপায় আছে। একটি হলো ফুল দিয়ে, আরতি করে, স্তোত্র পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণত যেভাবে পূজা করা হয়ে থাকে, সেইভাবে। লোকে ধর্মীয় ভক্তি ভাবাপ্লুত হয়ে আজও এরকম করে থাকে। তারা সারাদেশে তীর্থযাত্রায় বেরোয়, ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলিকে পালন করে, স্তোত্র পাঠ ও পূজার্চনা করে, পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বিভিন্ন পবিত্র নদীতে স্নান করে। কিন্তু সবই করে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই। এটি ভক্তির একরকম নিষ্ক্রিয় রূপ।

তাহলে ভক্তির সক্রিয় রূপটি কী? —জাতির ব্যবহারিক জীবনে এই মাতৃভূমির প্রতিটি কণার সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের সর্বস্ব অর্পণে সদাজাগ্রত ভাবের প্রকাশ ঘটানো। এই কঠিন বাস্তব জগতে এই ধরনের সক্রিয় অভিব্যক্তিরই গুরুত্ব রয়েছে। এই ধরনের ভক্তিতে দেদীপ্যমান কোনও হৃদয় নিজের আরাধ্য অর্থাৎ মাতৃভূমির সামান্যতম অপমানও সহ্য করতে পারে না। সে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে এবং যতক্ষণ না এই অপমানের জন্য দায়ী আগ্রাসী শক্তি এমন অবস্থায় পৌঁছয় যাতে দ্বিতীয়বার এই ধরনের অপরাধ করতে না পারে, ততক্ষণ সে বিশ্রাম নেয় না। অতীতের সমস্ত অপমান ও অবমাননার শোধ নেওয়ার জন্য এক দৈবী অসন্তোষ তার হৃদয়ে জ্বলতে থাকে।

এই সক্রিয় ও বিজিগীষু প্রেরণা না থাকলে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আত্মোৎসর্গও তেমন কাজের হবে না। এই কঠিন বিশ্বসংসার হলো পশুশক্তির সঙ্গে পরীক্ষার ক্ষেত্র। এখানে নিছক ভালমানুষি বা মহৎ গুণাবলী যা 'সত্ত্ব' ভাবেরই নিষ্ক্রিয় রূপ, তা এক মুহূর্তের জন্যও টিকতে পারবে না। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাই, পূর্ণ ভগবদ্ভক্তি, ভক্তি, সততা ও ধর্মীয় নিষ্ঠা থাকা

সত্ত্বেও বিগত হাজার বছর ধরে আমরা বিদেশি আক্রমণকারীদের পদতলে পিষ্ট হয়েছি। পক্ষান্তরে ভালমানুষি ও সদ্‌গুণ বস্তুটার সঙ্গে একেবারে পরিচিতি না থাকলেও বীরোচিত কাজ ও সংগঠিত প্রয়াসের প্রতি ওই বিদেশি আক্রমণকারীদের বিশেষ আগ্রহ ছিল, অর্থাৎ তারা ছিল রজোগুণে পূর্ণ। আমাদের ইতিহাসে এই সত্যেরও সাক্ষ্য আছে যে, যখনই আমাদের জনগণ বিজিগীষু মনোভাব উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, সত্ত্বগুণের সক্রিয় রূপের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তখনই শত্রুদের শয়তান-সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

আমাদের পুরাণেও এই শিক্ষাই পাই। পুরাণে দেবতা ও রাক্ষসদের মধ্যে লড়াইয়ের কাহিনি আছে। প্রায়শই দেখা যায়, দৈবী শক্তি থাকা সত্ত্বেও দেবতারা সংগঠিত ও জঙ্গি রাক্ষসদের হাতে পরাজিত হচ্ছেন। দেবতারা তখনই কেবল রাক্ষসদের পরাজিত করতে পেরেছেন যখন তাঁরা বীরত্বপূর্ণ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। ক্রিয়াশীলতা, তৎপরতা এবং বীরত্বই জগৎ শাসন করে। প্রকৃতপক্ষে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এই কথাটির মধ্যেই সফল জীবনদর্শনের সারাৎসার নিহিত।

আমরা কি বেঁচে আছি?

মাতৃভূমির প্রতি এইরূপ অগ্নিময় ও বীরত্বপূর্ণ ভক্তি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আজ জীবিত আছে? যদি আমাদের নেতাদের মধ্যে এবং আমাদের জনসাধারণের মধ্যে এই উদ্দীপনা বজায় থাকত, তাহলে কি দেশবিভাগ সম্ভব হোত? সেই সময়ে ব্রিটিশ ও মুসলমানদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অটল সংকল্প নিয়ে বীরের মতো সকল দেশবাসী কি ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে রুখে দাঁড়াত না এবং মাতৃভূমির পবিত্র অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তাদের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু ঢেলে দিত না? হায়! সেরকম কিছুই ঘটল না। বরং তার বিপরীত, নেতাদের কথায় জনসাধারণ তথাকথিত স্বাধীনতার আগমনের জন্য উৎসবের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিছু লোক আছে যারা বলে, 'যা হয়ে গেছে, তাকে ভুলে যাও। মৃত বিষয়কে উস্‌কে তুলে লাভ কী? মোট কথা, দেশবিভাগ এমন একটি তথ্য যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।' এটা কেমন করে সম্ভব? খণ্ডিত দেহে মা যখন পুত্রের মুখের দিকে প্রতিদিন একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন, তখন পুত্র কেমন করে সব ভুলে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? ভুলে যেতে পারে? মায়ের প্রকৃত সন্তান কোনও দিনই ভুলতে পারে না এবং মায়ের অখণ্ড মূর্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে না। দেশবিভাগ যদি চূড়ান্ত তথ্য (Settled fact) হয়, তাহলে তাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য আমরা রয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে চূড়ান্ত তথ্য বলে কোনো কিছু নেই। একমাত্র মানুষের ইচ্ছাতেই কোনও কিছু চূড়ান্ত হয়, আবার তা ব্যর্থও হয়। এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তি সেই সুমহৎ উৎসর্গের মনোভাব দিয়ে ইস্পাত-দৃঢ়তা লাভ করে, মানুষের কাছে যা সৎ ও গৌরবজনক। সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থেকে এই ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়।

আবার কিছু লোক আছে যারা দেশবিভাগকে সমর্থন করে এই যুক্তি দেখায় যে, 'আসল কথা হলো হিন্দু আর মুসলমান ভাই-ভাই। দেশবিভাগ হলো ভাইদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারার মতো।' কিন্তু কেউ কি কোনো দিন শুনেছে যে, মাকে সাধারণ সম্পত্তি হিসেবে তাঁর সন্তানরা কেটে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিয়েছে? কী চরম নীতি-ভ্রষ্টতা! মাতৃভূমি যেন এক পণ্য বস্তু হয়ে পড়েছে, শুধু ভোগের ভূমি, ঠিক হোটেলের মতো! সে যেন আমাদের ধর্মভূমি, কর্মভূমি ও পুণ্যভূমি নয়। মায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে টেনে ছিঁড়ে এবং আমাদের লক্ষ লক্ষ মা-ভাই-বোনের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আমরা এই জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দিয়েছি। আজও দেশ-বিভাগের শোচনীয় ঘটনার সমাপ্তি ঘটেনি। কাশ্মীরকেও খণ্ডিত করা হয়েছে।

'একটি ঘাসও জন্মায় না' মনোভাবের ফল

আমাদের দেশে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা দেশের উপর বহিরাক্রমণ ঘটলে, এমনকী মাতৃভূমির কোনো অংশে আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলেও হাল্‌কা ভাবে বলেন— যেতে দাও। চীনারা লাদাখের অংশবিশেষ দখল করে নিলেও তাঁরা বলেন— 'ছেড়ে দাও। ওখানে একটি ঘাসও গজায় না।' কিছুকাল আগে নেফা অঞ্চল সম্পর্কে একটি সুপরিকল্পিত অপপ্রচার চালানো হয় যে, ওটা এক অভিশপ্ত জায়গা, যা মানুষের বসবাসের অনুপযুক্ত, যেখানে বিষাক্ত সাপ ও জোঁক কিলবিল করছে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের কণ্ঠনালীর মধ্যে ঢুকে সেগুলি তাঁদের রক্ত চুষে নেবে।' এমনকী আমাদের সংবাদপত্রগুলি, যাদের উপর জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার এবং জলন্ত দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে, তারা পর্যন্ত উক্ত অপপ্রচারকে বিজ্ঞাপিত করে এবং আমাদের নিজেদের ভূখণ্ড সম্পর্কেই জনগণের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে।

কচ্ছের রান সম্পর্কেও একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটে। পাকিস্তান দ্বারা ওই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ আক্রমণ ও দখল করার ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে ওই অঞ্চল সম্পর্কে বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী সংবাদও আমাদের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হতে থাকে। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার ওই অঞ্চল সম্পর্কে যে পুস্তিকা প্রকাশ করে, তাতেও ওই অঞ্চলকে একটি জলাভূমি বলে উল্লেখ করা হয় যেখানে 'একটি ঘাসও জন্মায় না, বছরের বেশির ভাগ সময় সমুদ্রের জলে ডুবে থাকায় ওই এলাকা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় এবং সেখানে এত বেশি মাছির উৎপাত যে এক পাত্র জল পান করতে গেলে কয়েকটা মাছিও সেই সঙ্গে গিলতে হয়' ইত্যাদি।

নেফা ও কচ্ছের রানের উপর বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রায় একই ধরনের প্রচার চালানো হয়, তার থেকে এইরকম সন্দেহ জাগে যে শত্রুরা যাতে এই দেশের জনসাধারণের

কোনোরকম বিরূপতা ছাড়াই ওই এলাকাগুলি গ্রাস করে নিতে পারে— সম্ভবত সেই রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করাই এইরূপ প্রচারকার্যের গূঢ় উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা কোনো রকম চিন্তা না করেই এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল। সেটা আরও খারাপ। তার কারণ কেউ যদি ভেবেচিন্তে এই ধরনের প্রচার করে, তা হলে তাকে বিকৃত মনোভাবাপন্ন লোক বলা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি স্বাভাবিকভাবে এরকম করে তাহলে বলতে হবে তার হৃদয়ের গভীরে মাতৃভূমির প্রতি সামান্যতম ভালবাসাও সে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসে আছে। এই অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আমাদের দেশের নেতারাই চীনের নির্লজ্জ আক্রমণ ও আমাদের হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা দখলকে 'সীমান্তের সংঘাত' অথবা 'সীমা নিয়ে বিবাদ' বলতে দ্বিধা করেননি। আমাদের নেতারা বলেন, 'তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর সীমারেখার কয়েক মাইল এদিকে বা ওদিকে সরে যাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। এর অনিবার্য অর্থ ছিল 'এদিকের' কয়েক হাজার বর্গমাইল ওদিকে সরে যাওয়া; তার বিপরীতটা কদাপি নয়। আমরা তাঁদের কাছ থেকে একথাও শুনেছি যে, সীমারেখা এখনও সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি এবং সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক চলছে। একবার চীন কর্তৃক আমাদের দেশের দখলীকৃত এলাকার উল্লেখ প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু একথা পর্যন্ত বলেন যে এলাকা 'আমাদের এলাকা বলে কথিত।'

দৃষ্টিকে প্রদীপ্ত রাখুন

হায়! আজ কোথাও আমরা আমাদের মাতৃভূমির সেই স্পন্দিত ও নন্দিত সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ করি না, যা আমাদের জনগণকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগ করতে অনুপ্রাণিত করবে। আপোশরফার মনোভাব— যে কেউ দেশকে খণ্ডিত করতে অগ্রসর হয় তার কাছে আমাদের মাতৃভূমির অংশবিশেষ সঁপে দিয়ে শান্তি ক্রয় করার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দেশের লোকেদের আঁকড়ে ধরেছে। এমনকী যে সমস্ত এলাকা শত্রুদের দখলে চলে গেছে, তার স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পাচ্ছে। আমাদেরই পবিত্র কৈলাস ও মানস সরোবরে আমাদের অবাধ যাতায়াত নিষিদ্ধ জেনে আমাদের মধ্যে কতজনের অপমান বোধ হয়? আমাদের পবিত্র সিন্ধুনদ যার নাম থেকেই আমাদের 'হিন্দু' ও 'হিন্দুস্থান' নামের উৎপত্তি, সেই পবিত্র নদে একটা ডুব দেবার পর্যন্ত উপায় নেই। একদা হিন্দু চিন্তা-ভাবনা প্রসারের বিশ্ব- কেন্দ্রস্থল তক্ষশীলা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। দানব হিরণ্যকশিপুর হাত থেকে প্রহ্লাদকে রক্ষা করার জন্য মহা ভয়ঙ্কর নরসিংহ যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই মূলস্থান (মূলতান) আজ আবার দানব-শাসনের পদানত। এই সমস্ত স্মৃতি কি আমাদের শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়?

আমাদের বিশেষভাবে এই ব্যাপারে নিজেদের এবং আমাদের আগামী বংশধরদের সতর্ক থাকতে হবে, নচেৎ বাহ্য পরিবেশের মারাত্মক প্রভাব আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেবে এবং আমাদের সকল উৎসাহ-অনুপ্রেরণাকে ধ্বংস করে ফেলবে। বর্তমান রাজনৈতিক সীমান্তকেই সম্পূর্ণ মাতৃভূমি বলে চিন্তা এবং সে কথাই বার-বার উচ্চারণ করতে-করতে আমাদের বিবেককেই আমরা মেরে ফেলেছি। এটি আমাদের পৌরুষের পক্ষে কী লজ্জাজনক, আমাদের বিচার বুদ্ধির পক্ষে কী অপমানজনক! কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণে এবং যুদ্ধ-জনিত ভাগ্য-বিড়ম্বনায় রাজনৈতিক সীমারেখার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু তার এই অর্থ কখনই হতে পারে না যে, রাজনৈতিক দিক থেকে যে অংশগুলি আমরা হারিয়েছি সেগুলি আর আমাদের মাতৃভূমির অংশই নয়।

এই সেদিন পর্যন্ত কি আমাদের সম্পূর্ণ দেশ বিদেশি ব্রিটিশদের অধীনতায় ছিল না? তার আগে আমাদের দেশের অংশ-বিশেষের উপর বহু শতাব্দীব্যাপী পাঠান-মোগলদের আধিপত্য ছিল না? অপর দিকে বিদেশিদের অধীনতা থেকে মাতৃভূমির ওইসব অংশগুলিকে মুক্ত করার জন্য আমরা কি সংগ্রাম করিনি, ত্যাগ স্বীকার করিনি? আর আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ধূলিকণা কি অসংখ্য বীর ও শহিদদের পবিত্র রক্তে সুরক্ষিত ও পুণ্য পবিত্র হয়ে ওঠেনি? আজ যদি আমরা বলি যে, আক্রমণকারীদের কাছে আমরা যা হারিয়েছি—তারা মুসলমান হোক অথবা চীনা— তার উপর আর আমাদের কোনো অধিকার নেই, ওদেরই তার উপর ন্যায্য অধিকার, তাহলে তার একটিমাত্র অর্থ দাঁড়ায় যে, আমরা সংগ্রামের ইচ্ছাশক্তিই হারিয়ে বসে আছি। আর আমাদের পৌরুষ এত নিম্নস্তরে নেমে গেছে যে, আমরা নিজেদের পরাজয় ও লাঞ্ছনাকে পর্যন্ত গৌরবজনক মনে করতে শুরু করেছি।

রাষ্ট্রীয় ইচ্ছাশক্তির এই অপমৃত্যুর বিরুদ্ধেই আমাদের আর সব কিছুর চেয়ে বেশি সতর্ক হতে হবে। যদি মাতৃভূমির মুক্তি ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করার ইচ্ছাশক্তি, তার জন্য কষ্টভোগ ও স্বার্থত্যাগের মানসিকশক্তি নির্বাপিত হয় তাহলে সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রের স্বাধনীতা ও মর্যাদাকে হত্যা করারই শামিল হবে।

পৃথিবীর বুকে স্বাধীন উন্নতিশীল ও গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু হলো মাতৃভূমির প্রতি গভীর, ক্রিয়াশীল, অবিভাজ্য ও অটল অগ্নিময় ভক্তি। আর আমরা, হিন্দুরা মাতৃভূমির প্রতি অতি উজ্জ্বল ভক্তিরই উত্তরাধিকারী। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত দেশভক্তির আগুনকে প্রচণ্ড উদ্দীপনায় আবার জাগিয়ে তুলতে হবে এবং আমাদের মাতৃভূমির উপর অতীতে যত আক্রমণ হয়েছে সেগুলিকেও ইচ্ছাশক্তির পবিত্র অগ্নিতে সংযুক্ত করে ভস্মসাৎ করে ফেলতে হবে। ভারতমাতার প্রাচীন অখণ্ড মূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নকে আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে।

(রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর চিন্তাচয়ন থেকে সংকলিত)

বামপন্থীদের ইতিহাসটাই দেশদ্রোহিতার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর চীন ভারত আক্রমণ করল। অসমের বমডিলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এল চীনা বাহিনী। ভারত-চীন সীমান্ত জুড়ে শুরু হলো সংঘর্ষ। দেশের এই সংকটের সময় সরকার 'দেশের ভূমি ও অখণ্ডতা' রক্ষার জন্য আহ্বান জানালো প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের কাছে। গড়া হলো 'জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল।' দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি দেশের অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমর্থনে পথে নামল। সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে উঠল দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধে। ঠিক সেই সময়টিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তখন অবিভক্ত) কী করছিল। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, পরে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালে রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু সেই সময় ঘোষণা করলেন, 'কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশ অন্য দেশ আক্রমণ করতে পারে না। চীন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ। অতএব চীন আক্রমণকারী হতে পারে না।' অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির গরিষ্ঠাংশের এটিই ছিল মনোভাব। সেই মনোভাবটিই ব্যক্ত হয়েছিল জ্যোতি বসুর কথায়। ভারতের মাটিতে হামলা করেছিল চীন--- অথচ চীনকে হামলাকারী বলে মানতে নারাজ ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। চীন-ভারত এই বিরোধের সময়টিতেই শ্রীলঙ্কার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী সিরিমাভো বন্দরনায়েক চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসেন এবং প্রস্তাব দেন। যা পরবর্তীকালে 'কলম্বো প্রস্তাব' হিসাবে খ্যাত। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা হরিনারায়ণ অধিকারীর লেখা (ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী) থেকে জানা যাচ্ছে, সেই সময় ভারতরক্ষা আইনে দমদম জেলে আটক অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির গরিষ্ঠাংশ নেতৃবৃন্দ কলম্বো প্রস্তাব মেনে চীনের সঙ্গে আলোচনার সমর্থক ছিলেন না। এঁরা চেয়েছিলেন, চীনের দাবি মেনে ভারত চীনের সঙ্গে আলোচনায় বসুক। অর্থাৎ, '৬২ সালে হামলাবাজ চীনের দাবি মাথা নত করে মেনে নিক ভারত সরকার এবং ভারত ভূখণ্ডে চীন অধিকৃত অংশকে বিনা বাক্যব্যয়ে চীনের হাতে তুলে দেওয়া হোক— এমনই আবদার ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের। এই ঘটনাতেই বোঝা যায় ভারতের প্রতি এদের আনুগত্য কতটা বা আদৌ ভারতের অখণ্ডতা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে এরা সম্মান করে কিনা। দেশ যখন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখন সেই বহিঃশত্রুকেই যারা সমর্থন করে বসে— তারা আদৌ দেশপ্রেমিক কিনা, দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে কিনা--- সে প্রশ্ন উঠবেই। এদেশের কমিউনিস্টদের নিয়েও সে প্রশ্ন উঠেছে। উঠবেও।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে দুবার বড়সড় ভাঙন হয়েছে। প্রথমবার, চীন-ভারত যুদ্ধের পরে ১৯৬৪ সালে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে জন্ম হয় সিপিএমের। দ্বিতীয়বার ১৯৬৯ সালে। সিপিএম ভেঙে জন্ম হয় সিপিআই (এমএল)-এর। যারা নকশালপন্থী হিসাবে পরিচিত হতে থাকে। এই সিপিআই (এমএল) গঠনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়, 'আমাদের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং-এর শিক্ষা স্মরণ রাখতে হবে— ''মূল হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধ কিন্তু কৌশল হবে কমরেড লিও পি আও-বর্ণিত কৌশল : 'তোমরা তোমাদের নিজের পথে যুদ্ধ চালাও, আমরা আমাদের মধ্যে যুদ্ধ করি, আমরা যখন জয়লাভ করতে পারি তখনই যুদ্ধ করি, যখন পারি না তখন সরে আসি' (ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী— হরিনারায়ণ অধিকারী)। এই নৈরাজ্যবাদী রাজনৈতিক দলটি জন্ম নেওয়ার পর কে এদের সর্বাগ্রে সমর্থন জানালো? ভারতের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাকা, ভারতের জমি দখল করতে আগ্রাসী চীন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এই নবগঠিত দলটিকে সমর্থন জানানো শুধু নয়, এদের সন্ত্রাসমূলক এবং ধ্বংসাত্মক কার্যপ্রণালীকে উৎসাহ দিতে বেজিং রেডিও থেকে বলা হলো— 'ভারতে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ।' আর এই নৈরাজ্যবাদীরা কী করল? এরা কোনো ভারতীয় মনীষীর নাম মুখে আনল না, কোনো ভারতীয় মনীষীর প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন করল না। যে চীন ভারতকে আক্রমণ করেছিল, সেই চীনের চেয়ারম্যানকেই নিজেদের চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষণা করে বসল। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে চীনের চেয়ারম্যানের বাণী এবং ছবি এঁকে শুরু করল ব্যক্তিহত্যা এবং সন্ত্রাসের রাজনীতি। এদের হাতে ধ্বংস হতে লাগল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এদের হাতেই খুন হলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় উপাচার্য ড. গোপাল সেন। দেশের

'পিপলস ওয়ার' পত্রিকার কার্টুনে তোজোর পাশে বামন নেতাজী।

মনীষীদের অবজ্ঞা করা, দেশের মনীষীদের মূর্তি ধ্বংস করা, বহিঃশত্রু চীনের সুবিধা হয় এমন কাজ করে যাওয়া, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এই অতি বামপন্থীরা কি কখনো দেশপ্রেমিক হতে পারে? পারে না, কখনই পারে না।

ভারতের বামপন্থী, অতি বামপন্থী রাজনীতির ইতিহাস যদি দেখা যায়, তাহলে এটাই দেখা যাবে যে, এরা বরাবরই ভারত রাষ্ট্রটির বিরোধিতা করে গিয়েছে। শুধু বিরোধিতা করা নয়, ভারত-বিরোধী শক্তিদের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে তারা। এক্ষেত্রে তাদের বন্ধু তালিকা থেকে ইসলামিক মৌলবাদী জঙ্গিরাও বাদ পড়ে নি। ১৯৪৬-৪৭ সালে, দেশ বিভক্ত হওয়ার পূর্বলগ্নে যখন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-র নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ 'মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তানে'র দাবিতে সরব— তখন তার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে এই কমিউনিস্টরাই। তারাই প্রকাশ্যে সেই সময় শ্লোগান দিয়েছে— 'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, পরে ভারত স্বাধীন হবে।' জিন্নাহর মুসলিম লিগ কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশান শুরু করার আগে ময়দানে যে জনসভা ডেকেছিল, সেখানে আমন্ত্রিত ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতায় এবং অক্টোবরে নোয়াখালিতে মুসলিম লিগের ওই নৃশংস হিন্দু হত্যার কোনো বিবরণ কোনোদিন ঠাঁই পায়নি কমিউনিস্ট পার্টির কোনো দলিলে। পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনকারী এই কমিউনিস্ট নেতারা কিন্তু দেশভাগের পর পাকিস্তানে থাকতে পারেনি। একবস্ত্রে তাদের চলে আসতে হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গে। এই পশ্চিমবঙ্গেই তারা জাঁকিয়ে বসে রাজনীতি করেছেন। মন্ত্রী-সান্ত্রী হয়েছেন। আবার এরাই শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে কুৎসা রটিয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদকে 'সাম্প্রদায়িক' বলেছেন। রাজ্যের প্রাক্তন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকার করেছেন! এই বামপন্থী এবং অতি বামপন্থীরা কাদের এজেন্ট? দেশের বিরুদ্ধে কার হয়ে কাজ করেন এরা? ১৯৪৭-এ পাকিস্তানের হয়ে দাবি তোলা এবং পরবর্তীকালে চীনের সমর্থনে গলা ফাটানো বামপন্থীদের কার্যকলাপ দেখলেই বুঝবেন— ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে চীন এবং পাকিস্তানের সুবিধা করে দেয়, দেশের ভিতর নাশকতায় অভ্যস্ত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি যাতে আরও মদত পায়— তেমনই কাজ এরা স্বাধীনতার পর থেকে গত সত্তর বছর ধরে ক্রমান্বয়েই করে আসছে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ শুধুমাত্র পাকিস্তান আদায় করেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। জিন্নাহ চেয়েছিলেন ভারত রাষ্ট্রটিকে ভিতর থেকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে যখন কেরলের

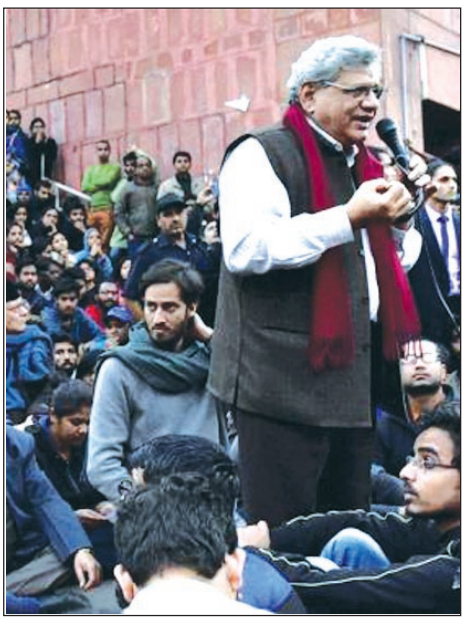

জেএনইউ-তে কানহাইয়া কুমারের সমর্থনে সিপিএম নেতা ইয়েচুরি।

মোপালা মুসলমানরা জিন্নাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেন— 'কেরলকেও আপনি পাকিস্তানের জন্য দাবি করুন'—তখন জিন্নাহ তাদের বলেছিলেন— 'না, আপনারা বরং ভারতের ভিতর থেকে ভারতকে ভেঙে দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যান।' স্বাধীনতার সত্তর বছর পর জিন্নাহ্র সেই দাবি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে নেমে পড়েছে ভারতীয় কমিউনিস্টরা। যাদবপুর এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাম-অতি বাম ছাত্র সংগঠনগুলি আওয়াজ তুলছে— 'মণিপুর, কাশ্মীর, কেরল মাঙ্গে আজাদি।' আওয়াজ তুলছে— 'ভারত কো টুকরা টুকরা কর দো।' মণিপুর, কাশ্মীর এবং কেরল ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কার লাভ? কার লাভ ভারত টুকরো টুকরো হয়ে গেলে? লাভটা যে ভারতের দুই চিরশত্রু পাকিস্তান এবং চীনের— তা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যারা ভারতকে এভাবে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার কথা বলে, যারা কাশ্মীর, মণিপুর, কেরলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার কথা বলে— তারা কি দেশকে ভালোবাসে? না, কখনই না। এই দেশবিরোধী, দেশদ্রোহী বামপন্থীরা কাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতারা, মুম্বই বিস্ফোরণে জড়িত জঙ্গি— সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এরা নিহত হলে বা এদের ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হলে— বামপন্থীরা শোকের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। অতি বামপন্থী লেখিকা প্রকাশ্যে ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর হামলা চালাতে মাওবাদীদের উৎসাহ দিচ্ছেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেও এই বামপন্থীদের দ্বিচারিতা দেখুন। দেশের ভিতর উগ্র ইসলামিক মৌলবাদীদের দাপট যখন দিন দিন বাড়ছে, তখন এদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বামপন্থীরা। বরং, এই ইসলামিক মৌলবাদের যারা বিরোধিতা করছে, তাদের 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যা দিয়ে কুৎসা রটাতে দ্বিধা হচ্ছে না বামপন্থীদের। কেরলের মতো রাজ্যে তো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কর্মীদের ওপর প্রতিদিনই হামলা-আক্রমণ জারি রেখেছে বামপন্থীরা। ইসলামিক মৌলবাদীদের তুষ্ট করতে প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ধর্মীয় আবেগে আঘাত দেওয়ার মতো নক্কারজনক কাজটিও এই বামপন্থীরাই করছে।

এরাই ক্ষুদিরাম বসুকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলেছে। সুভাষচন্দ্র বসুকে বলেছে 'তেজোর কুকুর।' এদের থেকে দেশ মহৎ কিছু আশা করেনি কখনও। আজও করে না। এই দেশদ্রোহী, রাষ্ট্রবিরোধীদের চিনে নেওয়াটা খুবই জরুরি। ভারতের অভ্যন্তরে থাকা এই ভারতবিরোধী শক্তিরাও কখনও ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না। ভারতের অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা রক্ষায় আজ যখন বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব— তখন দ্বিতীয় লড়াইটা জারি রাখতে হবে দেশের ভিতরে এই শত্রুদের ভিতরে। দেশবিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী এই শক্তিকে ভারত ছাড়া করাই যেন হয় আমাদের সংকল্প।

এই সময়

বৃক্ষমানবী

মানুষের গালে গাছের ছাল! পরিভাষায় একে বলে ট্রিম্যান সিন্ড্রোম। এমনই এক

আজব অসুখে আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের সাহানা খাতুন। তার চিবুক, নাকের ডগা, ডান গাল এবং দুই কানের আশেপাশে গাছের ছাল বেরোচ্ছে। চিকিৎসকেরা এখনও অথৈ জলে।

আড়ালে টাকা

বাইরে থেকে দেখলে হট কেস। তার ভেতরে দক্ষিণী খাবার উপমা। কিন্তু উপমার আড়ালে

পাচার করা হচ্ছিল ১.২৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। আগেভাগে খবর পেয়ে পুলিশ পুনে এয়ারপোর্ট থেকে গ্রেপ্তার করেছে দুজনকে।

চালকহীন

গত সপ্তাহে আমেরিকার আর্লিংটনে একটি চালকহীন গাড়ি দেখা গিয়েছিল। রোমহর্ষক

এই খবরে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি জানা গেছে গাড়িতে চালক ছিলেন। সিট কভার আর তার পোশাকের রং মিলে যাওয়ার তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

সমাবেশ -সমাচার

রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাতীয় সম্মেলন

গত ২৯, ৩০ জুলাই অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লির দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাবিদ্যালয়ে। সম্মেলনে আলোচনার বিষয় ছিল— 'ন্যাশনাল কনফারেন্স অন হায়ার এডুকেশন পারস্‌পেক্টিভস্‌ ইন ইন্ডিয়া।' দেশের ২২টি রাজ্য থেকে চার শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ২০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কলকাতা বিদ্যালয়ের ৪, আই আই ই এস টি শিবপুর-২, ইউনিভার্সিটি অ্যানিমাল অ্যান্ড ফিশারিজ সায়েন্স ৩, কল্যাণী বিদ্যালয়-২, গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ২, বর্ধমান

বিশ্ববিদ্যালয় ১, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ১, বিশ্বভারতী ৫ এবং রাজ্য কার্যকারী সমিতির ২ জন। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর।

কাটোয়ায় পরিবার প্রবোধন সভা

গত ২১ জুলাই বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরের পাবনা কলোনিতে শ্রীহরি মন্দির প্রাঙ্গণে পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে ৪৫ জন মা-বোন উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২২ জুলাই পাটুলী অঞ্চলের পীলা গ্রামে দম্পতি মিলনের আয়োজন করা হয়। তাতে ২৪ দম্পতি অংশগ্রহণ করেন। উভয় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিবার প্রবোধনের প্রান্তপ্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র এবং প্রান্তটোলির সদস্য বিনয়ভূষণ দাস।

মালদহের চাঁচলে সামাজিক সদ্‌ভাবনা বৈঠক

গত ৩০ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উদ্যোগে মালদহ জেলার চাঁচল থানাপাড়ায় বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে সামাজিক সদ্‌ভাবনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে বৈঠকে সূচনা করেন সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত কার্যবাহ তরুণ পণ্ডিত। সভাপতিত্ব করেন জেলা কার্যবাহ দেবব্রত দাস। বৈঠকে চাঁচল মহকুমার সামসী, চাঁচল, রতুয়া, মালতীপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর ও তুলসীহাটা থেকে গায়ত্রী পরিবার, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গসভা, গৌড়ীয় মঠ-সহ বিভিন্ন ধর্মীয় মত-পথের ৪০ জন সন্ত ও পদাধিকারী অংশগ্রহণ করেন। প্রধানবক্তা শ্রীপণ্ডিত সমর্থ ভারত গঠনের জন্য হিন্দুদের সংগঠিত হওয়া ও করার আহ্বান জানান। উপস্থিত পদাধিকারীরা তাঁদের বক্তব্যে হিন্দু সমাজের ভেদাভেদ দূরীকরণের জন্য তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা থাকবে বলে জানান। বৈঠক পরিচালনা করেন তুলসীহাটা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হরেন্দ্রনাথ পাল।

এই সময়

ঠাম্মা

তিনি গান গাইতে ভালোবাসেন। গলায় সর্বক্ষণ গিটার ঝোলে। বয়স মোটে একাশি

বছর। পাড়াপড়শির প্রিয় ঠাম্মা সিঙ্গাপুরের মেরি হো তাঁর রকস্টার হবার অপূর্ণ সাধ এবার পূরণ করতে চান। আমাদের শুভেচ্ছা রইল।

সফরসঙ্গী

ভারতে জন্তুজানোয়ার নিয়ে ট্রেনে ওঠা নিষিদ্ধ। অথচ আমেরিকার বোস্টনে এক ব্যক্তি আস্ত সাপ নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। অ্যানে কিন ঘটনাটি দেখে ছবি তুলে টুইটারে পোস্ট করেন। তার প্রশ্ন, আমেরিকায় কি আইন বলে কিছু নেই?

আমাকে বাঁচান

বিশাল সূর্যবংশী পুনের জিওন সিনেমা হলে শাহরুখ খান-অনুষ্কা শর্মা অভিনীত জব

হ্যারি মেট সেজল দেখছিলেন। দেখতে দেখতেই সুষমা স্বরাজকে টুইট করলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে বাঁচান।' মোক্ষম রসিকতা। খুব হেসেছে সোশ্যাল মিডিয়া।

সমাবেশ -সমাচার

মালদহের বামনগোলায় ধর্মসভা

গত ৬ আগস্ট মালদা জেলার বামনগোলা গোবরাগুড়ি পঞ্চতীর্থ মহাশ্মশানে হিন্দু জাগরণ সেবা সমিতির উদ্যোগে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এক হাজারের বেশি মানুষ ধর্মসভায় যোগদান করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী জীবানন্দ মহারাজ ও স্বামী রামানন্দ মহারাজ। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন বামনগোলার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকর্তা নরেন

দাস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ সহপ্রান্ত কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত। পরে সবাই নগর সংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন।

রায়গঞ্জে বি এস এফ ক্যাম্পে সেবিকা সমিতির রাখিবন্ধন

গত ৭ আগস্ট রাখীপূর্ণিমার দিন রায়গঞ্জ নগরের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সেবিকারা রায়গঞ্জ শহরে সীমা সুরক্ষা বাহিনীর শিবিরে জওয়ান-ভাইদের হাতে রাখি ও কপালে তিলক পরান। পরে জওয়ান-ভাইয়েরা সেবিকা-বোনেদের চা-পানের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। সেখানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন সেবিকা সমিতির উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঞ্চালিকা শ্রীমতী মুক্তিপ্রদা সরকার।

এই সময়

হেলমেট উপহার

নিজামাবাদের সাংসদ কে. কবিতা এবারের রাখিবন্ধনে ভাইকে হেলমেট উপহার

দেওয়ার জন্য বোনেদের কাছে আবেদন করেছেন। রাখিবন্ধন উৎসবে বোনেরা ভাইয়ের সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। সেই প্রেক্ষিতে উদ্যোগটি প্রশংসনীয়।

জাঙ্কফুডে নিষেধাজ্ঞা

স্কুলের ২০০ মিটারের মধ্যে জাঙ্কফুড বিক্রি করতে দেওয়া চলবে না। দ্য স্টেট কমিশন

ফর প্রোটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (এস সি পি সি আর) একথা স্পষ্ট করে উত্তরাখণ্ড সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। মহারাষ্ট্র সরকার ইতিমধ্যেই এই নিয়ম চালু করেছে।

ধৃত

নকশাল নেতা তুষারকান্তি ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করল গুজরাট পুলিশ। তিনি

গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে কলকাতা থেকে নাগপুর যাচ্ছিলেন। নাগপুর স্টেশনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাঙ, সুরাট এবং নবসারি জেলায় তিনি জঙ্গি আন্দোলন ছড়িয়ে দেবার কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ।

সমাবেশ -সমাচার

রায়গঞ্জ শহরে সংস্কার ভারতীর রাখিবন্ধন

গত ৭ আগস্ট রাখিপূর্ণিমার দিন সংস্কার ভারতী, রায়গঞ্জ শাখার পরিচালনায় বিশেষ ভাবে রায়গঞ্জ শহরের মধ্যস্থল মোহনবাটি এলাকায় প্রধান রাস্তার ধারে সঙ্গীত পরিবেশন-সহ রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। পথ চলতি সাধারণ মানুষ, সাইকেল ও রিক্সা আরোহী এবং চালকসহ প্রত্যেককে সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা ধরে রাখি পরানো এবং সকলের সঙ্গে শুভেচ্ছা

বিনিময় করা হয়। এতে শহরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। পথের ধারে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে সঙ্গীত শ্রবণ করেন ও রাখিবন্ধনের দৃশ্য অবলোকন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক বিকাশ কুমার ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ বিপ্লব কুমার দে, লোককলা প্রমুখ শ্রীমতী শুক্লা অধিকারী।

পরলোকে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৬ আগস্ট কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে সপ্তাহখানেক রোগভোগের পর অমৃতলোকের পথে যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর ৫ মাস। কাশীতে বাল্যকালেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারকে কাশীতেই দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সেখানে থাকতে থাকতেই ছাত্রাবস্থায় সঙ্ঘের প্রচারকজীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক রজ্জু ভাইয়ার সঙ্গেই প্রচারকজীবন শুরু করেন। পরে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা আসার সময়ে (১৯৪৮) উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বাংলার মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজও করতেন। নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর তিনি বাংলায় আসেন প্রচারক হিসেবে এবং প্রথমে নবদ্বীপে নিযুক্ত হন। পরে কলকাতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান স্ট্রিট অঞ্চলে কাজ করেন। সেই সময়েই তিনি হিন্দুস্থান সমাচারের কাজও করতে থাকেন। পরে সংসারজীবনে প্রবেশ কারণ। বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করার পরে তিনি 'ঊষা' কোম্পানিতে যোগদান করেন এবং সেইখান থেকেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে থাকার সময়ে কলকাতার মধ্যভাগের সঙ্ঘচালক হিসেবেও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্রীগুরুজী সমগ্র দর্শনের অনুবাদ তাঁর সফল প্রয়াস। মৃত্যুকালে পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা-সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। গত ১৩ আগস্ট কলকাতার কেশবভবনে তাঁর উদ্দেশে স্মরণসভায় তাঁর স্মৃতিচারণ করেন অজিত বিশ্বাস, ডাঃ চিন্ময় শীল, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সুশীল রায় প্রমুখ।

‘ভারত ছাড়ো’-সহ গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল আর এস এস

অতিথি কলম

রাকেশ সিনহা

সাম্প্রতিক তাঁর এক ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ‘ব্রিটিশ ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথা শোনাচ্ছিলেন। যা বরাবর ঘটে আসছে এবারও কংগ্রেস ও বামপন্থীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে বিদ্রূপ করে স্মরণ করতে থাকে—সে সময় তাঁর আদি সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কী ভূমিকা ছিল।

এই প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত। রাজনৈতিক আলোচনায় বিদ্বজনদের লেখালিখিতে মূলত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলিতে যুগ যুগ ধরে নিয়ম করে সঙ্ঘকে ব্রিটিশের স্বপক্ষে ভূমিকা নেওয়া ও সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করে আসা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতকে সূত্র করে যদি আমরা অতীত ঘটনাকে ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করি তাহলে ইতিহাসের চরম বিকৃতি ঘটানো হবে। আর আজকের শাসকদলের গৃহীত অবস্থানের চশমায় স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তাই প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরতে পারে না। বস্তুত প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য বামপন্থী ইতিহাসবিদ ও নেহরুবাদী পণ্ডিতদের প্রচারিত ইতিহাসের বিপরীত ক্ষেত্রে অবস্থান করছে।

১৯৩৯-৪০ সালের তৎকালীন ইংরেজ অধীনে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো।১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইংরেজ সরকার তৎকালীন এআরপি ও সিভিক গার্ড নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছিল। এই সময় হিন্দুমহাসভা-সহ নাথুরাম গডসের হিন্দুরাষ্ট্র সেনা এই সুযোগকে কাজে লাগাতে বেশি করে তাদের কর্মীদের এই ক্ষেত্রে যোগদান করার আদেশ দেয়। উদ্দেশ্য ছিল কিছুটা সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে ভবিষ্যতে সুযোগ এলেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে। এই সংস্থাগুলি ইংরেজের হয়ে সবরকমের নিযুক্তি শিবির চালানোর পাশাপাশি চাকরির জোগাড়ের এজেন্ট হিসেবেই কাজ করত।

তৎকালীন সঙ্ঘ সংগঠকরা কিন্তু এই পরিস্থিতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এই প্রক্রিয়াকে বাতিল করেছিলেন। ঘটনাটি ইংরেজ প্রশাসনের নজরও এড়ায়নি। সেই সময় দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক সংবলিত সংস্থা হয়ে ওঠায় ইংরেজ সরকার তৎকালীন সেন্ট্রাল প্রভিন্স সরকারকে criminal law amendment Act-এর ১৬ নং ধারা প্রয়োগ করে (XIV of 1908) সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আদেশনামা জারি করতে বলে। প্রদেশের মুখ্য সচিব জি এম ত্রিবেদী সরকারকে জানান যে এই ধরনের কোনো কাজ করলে রাজ্যে প্রবল জনবিক্ষোভ দেখা দেবে। তাই এই ব্যবস্থা অনুমোদন করা উচিত নয়। ১৯৩০-এর দশকেই সঙ্ঘকে দমন করার হাল্কা কোনো প্রচেষ্টা নিলেই তা সরকারের ওপর বিক্ষোভ ও পরিণতিতে তাদের অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলত।

> “সঙ্ঘ আন্তরিকভাবে গান্ধীজীর আন্দোলনে শামিল হলেও কোনো দিনই ইংরেজ শাসককে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে হঠানোর প্রবণতা ও লক্ষ্যকে বিসর্জন দেয়নি। প্রকৃত সত্য হলো, সঙ্ঘের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাকে ঐতিহাসিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই ব্যর্থতা সামগ্রিকভাব অ-বামপন্থী প্রতিটি ঐতিহাসিকের।”

'আইন অমান্য আন্দোলনে' সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা ঘোষণা করার পরই ইংরেজ নিঃসংশয় হয়ে যায় যে সঙ্ঘ হিন্দুমহাসভার লেজুড়বাহী নয়। সেন্ট্রাল প্রভিন্স (বর্তমান মধ্যপ্রদেশ) ও প্রায় তহশিলের পুলিশ কর্তাদের দেওয়া নিয়মিত পাক্ষিক রিপোর্টে জানা যায় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের সক্রিয় অংশগ্রহণের পর থেকে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক গতি পেয়েছিল। তিনি হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে নিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ১ বছর কারাদণ্ড হয়।

সঙ্ঘের এই ইংরেজ বিরোধী সক্রিয় অবস্থান সরকারকে খেপিয়ে তুলতে থাকে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, 'সম্প্রতি সঙ্ঘ সদস্যরা সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করেছে। এর পরিণতিতে মধ্যপ্রদেশ সরকার সরকারি কর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে (circular letter no. 2352-2158 IV. dt. 15/ 16 Dec, 1932) 'সঙ্ঘের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত রাজ-কর্মচারীদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং কোনো মতেই এদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা চলবে না। এদের কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, সদস্য হওয়ার তো প্রশ্নই নেই।'

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৪ সালে ৭-৮ মার্চ আর এস এসের আদর্শ, সংগঠন নিয়ে দু'দিনের দীর্ঘ বৈঠকের পর ইংরেজ সরকার কোনোভাবেই আর এস এসকে সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সেই সভার সভাপতি রাঘবেন্দ্র রাও এম এস রহমান নামে এক মুসলমানের প্রশ্নে যে কোনো ব্যক্তি, মুসলমান সম্প্রদায় আর এস এসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করেছে কিনা বা সরকার এই মর্মে কোনো প্রমাণ হাজির করেছে কিনা জানতে চাওয়ায় বহু অনুসন্ধান ও একান্ত চেষ্টার পরও কিছু দেখাতে না পারায় রহমান ও উপস্থিত অন্যরা সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইংরেজ সরকার সঙ্ঘ বিরোধী সার্কুলার তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

এই আক্রমণ ছিল লাগাতার। ১৯৪০ সালের ৫ আগস্ট ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া রুলের অধীনে সরকার সঙ্ঘের ড্রিলকে নিষিদ্ধ করে অধ্যাদেশ জারি করে। সঙ্গে ইউনিফর্ম ও প্রকাশ্য শরীরচর্চাও নিষিদ্ধ করা হয়। এই ভাবে সঙ্ঘের অগ্রগতিকে আটকানোর প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হবে সরকার হাতে হাতেই তার প্রমাণ পায়। হাজার হাজার স্বয়ংসেবক এই আইনের বিরোধিতা করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সঙ্ঘ যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে এটা ইংরেজের তরফে ছিল চরম আতঙ্ক। এই বছরেই আগস্ট মাসে চিমুর ও অস্তি অঞ্চলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা কংগ্রেসিদের তুলনায় বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। তারা সংশ্লিষ্ট পুলিশ থানা আক্রমণ করে। এই তালুকাগুলির পুলিশ বাহিনী তাদের ওপর তীব্র অত্যাচার চালায়। মনে রাখা দরকার, এই আন্দোলনে ধৃত যাঁদের ফাঁসি হয় ও যাঁরা আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তাঁদের গরিষ্ঠাংশই ছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্ঘের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া ইংরেজকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। ইংরেজ ভাবতে শুরু করে নেতাজীর আইএনএ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এক সশস্ত্র গোপন ইংরেজ বিরোধী বিপ্লব করতে পারে, কেননা উভয়েরই চিন্তাধারায় সাযুজ্য রয়েছে।

ইংরেজের চিন্তা খুব অমূলক ছিল না। সরকার তার বিভিন্ন দপ্তরে দেওয়া সার্কুলারে জানায় 'আপনারা সাবধান হয়ে যান, আর এস এসের সমর্থকরা সেনা, পুলিশ, নৌবাহিনী, ডাক তার বিভাগ সর্বত্রই ঢুকে পড়েছে, তারা উপযুক্ত সময় এলেই অতি সহজে প্রশাসনিক ক্ষমতা কবজা করে নিতে পারে।' সরকার আরও জানিয়েছিল যে এই সংগঠনের ধ্যান-ধারণা চরমভাবে ব্রিটিশ বিরোধী এবং এরা ক্রমশই চরমপন্থী, সশস্ত্র বিরোধিতায় বিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এবার সরকার বাহাদুরের এ সংক্রান্ত প্রকৃত মতলব কী ছিল তা দেখা যাবে। ১৯৪৩ সালের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ১৩ ডিসেম্বর অন্যতম আধিকারিক জিএ আহমেদের দেওয়া নোট থেকে 'কোনো সংগঠনের পক্ষে যে কোনো শিবির বা প্রকাশ্য অনুষ্ঠান আয়োজন করাকেই ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনের আওতায় নিষিদ্ধ করতে হবে। এটা করলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর এস এস, কেননা তারাই সব থেকে বেশি শিবিরের আয়োজন করে।' এরই পরিণতিতে সঙ্ঘ আয়োজিত প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে ব্যাপক হানা দেওয়া শুরু হয়। চলে কাগজপত্র, অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করার, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসেবকদের ধরপাকড়।

বলা দরকার, সঙ্ঘ আন্তরিকভাবে গান্ধীজীর আন্দোলনে শামিল হলেও কোনো দিনই ইংরেজ শাসককে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে হঠানোর প্রবণতা ও লক্ষ্যকে বিসর্জন দেয়নি। প্রকৃত সত্য হলো, সঙ্ঘের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাকে ঐতিহাসিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এই ব্যর্থতা সামগ্রিকভাব অ-বামপন্থী প্রতিটি ঐতিহাসিকের।

উল্টোদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ না নিয়েও (স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা আজ সর্বজন বিদিত) কেমন অবলীলায় বামপন্থী বাহিনী বিপ্লবীর বেশে ঘুরছে। তার একমাত্র কারণ তাদের তরফে বরাত দিয়ে উৎপাদিত এক শ্রেণীর সশক্ত তথাকথিত বৌদ্ধিক বাহিনীর সরব উপস্থিতি। যাইহোক, এখন আমাদেরই কিন্তু দায়। কোনো মিথ্যে অভিযোগের ভয়ে আতঙ্কিত না হয়ে জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করার এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধারাবাহিক প্রচেষ্টাকে স্তব্ধ করে সঠিক ইতিহাস দেশবাসী তথা নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার।

(লেখক ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা ও চিন্তাবিদ)

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের কলমচিরা সাম্প্রদায়িকতার জুজু ছেড়ে সরাসরি হিন্দুত্বের জুজু দেখিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার একটি চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে পেশাগত সাংবাদিক ছাড়াও কলেজ অধ্যাপক এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা আছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই ওপার বাংলার দেশ বিভাজনের বলি, এপার বাংলায় পালিয়ে আসা নাগরিক। যদি ওদের কখনও প্রশ্ন করা হয় বাংলাদেশ থেকে হিন্দুবাঙালি বিতাড়নের বিরাম নেই কেন? সোজা উত্তর মিলবে— 'ভারতের সংবিধানে সর্বধর্মের সহাবস্থানের কথা বলা আছে। সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের আনুগত্য থাকা নৈতিক কর্তব্য।' অতএব আপনাকে মেনে নিতে হবে এপার বঙ্গে মুসলমান বাঙালির সঙ্গে হিন্দু বাঙালির সহাবস্থান যতটা সহজ ওপার বঙ্গে ততটা সহজ নয় এবং ধরে নিতে হবে এপার বঙ্গে সকল মুসলমান বাঙালি সেকুলার। কালিয়াচক, তেহট্ট, খাগড়াগড় এবং ধুলাগড়ের ঘটনা ওই কলমচিদের কাছে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কিছু নয়। এপার বাংলার হিন্দু বাঙালির অভাব-অভিযোগ, ভূত-ভবিষ্যৎ ওইসব মান্যবর কলমচিদের কল্পনার অতীত। যাইহোক একটা চরম সত্যকে অস্বীকার করা যাদের মজ্জাগত স্বভাব তাদের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে একটা সাবধান বাণী রেখে গেছেন তাঁর 'ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা' নিবন্ধে— 'হিন্দু বাঙালির সূর্যই সূর্য আর মুসলমান বাঙালির সূর্য তাম্বু, এমনতরো বিদ্রূপেও যদি মনে সংকোচ না জন্মে, এতকাল একত্রবাসের পরেও আড়াআড়ি ধরাতলে মাথা ভাঙাভাঙি ছাড়িয়ে যদি অবশেষে চন্দ্র সূর্যের ভাষাগত অধিকার নিয়ে অভ্রভেদী হয়ে ওঠে, তবে আমাদের ন্যাশনাল ভাগ্যকে কি কৌতুকপ্রিয় বলব না বলব পাড়াকুঁদুলে। পৃথিবীতে আমাদের সেই ভাগ্য গ্রহের যারা প্রতিনিধি তারা মুখ টিপে হাসছেন। আমরাও হাসতে চেষ্টা করি কিন্তু হাসি বুকের কাছে এসে বেধে যায়। পৃথিবীতে কম্যুনাল বিরোধ অনেক দেশে অনেক রকম চেহারা ধরেছে কিন্তু বাংলাদেশে সেটা এই যে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধরলো তাতে আর মান থাকে না।' (সূত্র— ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/রবীন্দ্র— রচনাবলী দশম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ পৃষ্ঠা-৭৮৮)

রবীন্দ্রনাথ যখন এই নিবন্ধটি লিখেছেন তখন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের বিভাজন রেখা প্রকট রূপ ধারণ করেছে। ১৯৩০ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার প্রাক্কালে কবি ইকবাল একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন— 'আমরা হলাম সাতকোটি মানুষ। ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত মানুষদের চেয়ে আমরা বেশি সমগোত্রীয়। বস্তুত ভারতবর্ষের মুসলমানরাই একমাত্র জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে আধুনিক অর্থে 'জাতি' শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। হিন্দুরা যদিও প্রায় সব বিষয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে আছে তবু একটি জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমগোত্রীয়তা তারা অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের দান হিসাবে তা আমরা পেয়েছি। সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলমানদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত'। এখানেই তিনি থেমে থাকেননি; তিনি আরও বলেছিলেন— 'একটি ভারতীয় জাতীর ঐক্য বাস্তব অবস্থায় বৈপরীত্যের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা পাওয়া যাবে পারস্পরিক ঐক্য ও বহুজনের সহযোগিতার মধ্যে। নিজ ভূমিগুলিতে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হবার অধিকার ভারতীয় মুসলমানদের আছে— এই নীতিকে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার ভিত্তি বলে গণ্য করা হয় তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাদের সব কিছু বাজি ধরতে হবে।' (তথ্য সূত্র : দেশ বিভাগ : পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনি— ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৩৯)

রবীন্দ্রনাথ ও ইকবাল অখণ্ড ভারতের মহান কবিদের মধ্যে স্বমহিমায় উজ্জ্বল। একজন বাংলা ভাষায়, অপরজন উর্দু ভাষায়। প্রথম জনের উদ্ধৃতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ইঙ্গিত আছে দ্বিতীয় জনের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বিভেদ রেখা চিত্রিত হয়েছে। স্বাধীনতার স্মরণীয় মুহূর্তের অনেক আগেই উভয়ই অল্প ব্যবধানে চলে গেছেন। এটাই ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য।

১৯৭৪-এর ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ খণ্ডিত স্বাধীনতা পেল কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ এখনও মুক্ত হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতার 'ফ্রানকস্টাইন দৈত্য'দের দৌরাত্ম্য উপলব্ধি করা আজকের ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের স্বভাব বিরুদ্ধ। গত ৩ জুলাই ২০১৭-য় 'স্বস্তিকা' পত্রিকায় মানস ঘোষ আক্ষেপ করে লিখেছেন— 'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতের রাজনীতিতে শ্যামাপ্রসাদের মাপের নেতা নেই এবং এ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে কিছু নেই। সুতরাং পাকপন্থী জামাতিরা যদি বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু বিতাড়নের প্রক্রিয়া শুরু করে তবে তারা আশ্রয় পাবে কোথায়? এই প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে আমার মনকে আলোড়িত করে চলেছে।'

যদি তাই হয় তখন ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা অভিযোগের তির হিন্দুত্ববাদীদের দিকে ছুঁড়ে যমালয়ের যাবার রাস্তাটা নিষ্কন্টক করার বড় দাবিদার হবে।

—বিরূপেশ দাস,
বর্ধমান।

চিঠিপত্র

একবার নমাজ

কেরলের ভাজাক্কাড় এলাকার ১৮টি মসজিদ-সহ এলাকার বড় জামা মসজিদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে— এখন থেকে দিনে

একবার লাউড স্পিকারের মাধ্যমে নমাজ পড়া হবে। অন্য চার বার লাউড স্পিকার ছাড়াই নমাজ পড়া হবে। শব্দ দূষণের কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত। দেরিতে হলেও মুসলমান সমাজের একাংশের এই সিদ্ধান্তকে জানাই স্বাগত।

ঈশ্বর আরাধনা একান্তই ব্যক্তিগত। আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতির জন্যই সকল ধর্মের মানুষ ঈশ্বর আরাধনা করে থাকেন। ঈশ্বর আরাধনা নীরবে, নিরিবিলি জায়গায় একান্তে মনে মনে করতে হয়। ঈশ্বর আরাধনার কথা মাইকের মাধ্যমে সকলকে জানানোর কোনও প্রয়োজন হয় না। মাইকের মাধ্যমে নমাজ পড়া মুসলমান সমাজ ছাড়া অন্য ধর্মের কেউ করে না।

উচ্চৈঃস্বরে মাইক বাজানোর ফলে এলাকার শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থ ব্যক্তিদের অসুবিধা হয়। শিশুদের কানের ক্ষতি হয়। ভারতের সব কটি মসজিদেরই মালাম্বুর ভাজাক্কাড়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা উচিত। প্রশাসনেরও উচিত শব্দ নিয়ন্ত্রণ করা।

—শ্রী অনিলচন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি কোচবিহার।

এক ট্রেনযাত্রীর যন্ত্রণা

গত ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা ছিল কলকাতায়। আগের দিন ট্রেনে আমার নিজের দাদা, বউদি আর দুই ভাইঝি উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ধমান যাবে বলে ট্রেনে চেপেছিল। রিজার্ভেশন ছিল। PNR 650329952, Train 1314, S-5/ Seat no. 5/6/8/16।

দাদা সপরিবার উঠে দেখেন যে, পুরো কামরা জবরদখল করে রেখেছে তৃণমূলি ক্যাডাররা। কী করে বোঝা গেল যে এরা তৃণমূলি? এদের প্রত্যেকের গলায় মমতার ছবি ঝোলানো। সারা কামরায় কোনো মহিলা নেই, সংরক্ষিত সব আসন ওদের দখলে। পুরো কামরা থিকথিক করছে 'দিদির ভাই'য়েরা। আমার দাদা অতি কষ্টে তিনটি মহিলাকে নিয়ে নিজেদের আসনের কাছে যখন পৌঁছলেন তখন সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। দাদাকে এবারে স্পষ্ট ভাষায় বলা হলো— 'আজকে রিজার্ভ টিজার্ভ ভুলে যান, আজ সবই তৃণমূল রিজার্ভ করেছে। কেটে পড়ুন।' দাদা প্রতিবাদ করায় উড়ে এল খিস্তি। অশ্লীল কথাবার্তা। আমার দুই ভাইঝি লায়েক। ছোটটি কলেজে। বড়টির বিয়ের আলাপ চলছে। সেই উপলক্ষেই যাওয়া। বর্ধমান থেকে দেওঘর, সেখানে ছেলের বাড়ির লোকজন রয়েছে কথাবার্তা পাকা হবে।

এদিকে সন্ধ্যা নামছে। কামরায় কোনো মেয়ে বা মহিলা নেই। সবই তৃণমূলের। এবার দুই ভাইঝি আর বউদিকে টার্গেট করে অশ্লীল কটু মন্তব্য শুরু হলো। ওই চিড়ে চ্যাপ্টা ভিড়ে ঠায় দাঁড়িয়ে একা দাদা কী করতে পারে! দাদাকে ওরা তুই-তোকারি করছিল। আর অসহায় তিনটি নারী এতগুলো তৃণমূলি গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। দাদার তখন নির্ভয়া-কাণ্ডের কথা মনে পড়ায় শিউরে উঠলেন। রাতের অন্ধকারে যদি এরা তাঁকে মেরে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়, কে বাঁচাতে আসবে?

তিনটি অসহায় নারীকে যতটা অসম্মান সইতে হয় সেটা সইতে হয়েছে সেদিন। মেয়ে দেখলেই লালসার জিভ বেরিয়ে আসে সেরকমই অধিকাংশ ক্যাডার। অন্তত একজনও ভদ্র মানুষ যদি ওই সমর্থকদের মধ্যে থাকতেন, তিনি নিশ্চয় বাধা দিতেন। দাদাকে একা পেয়ে তৃণমূলি গুণ্ডারা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। যাচ্ছেতাই গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। নিজের স্ত্রী-কন্যার অপমান লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখতে হয়েছে। নিজেদের রিজার্ভ সিটে মমতার পোষা গুণ্ডারা বসে যা ইচ্ছে তাই করেছে। কতক্ষণ আর দাঁড়ানো যায়! রাত নেমে এলেই নির্ঘাৎ আরেকটি নির্ভয়া কাণ্ড হতে পারত। কিন্তু দাদার সম্বিত ফিরে আসে। তিনি উপায়হীন হয়ে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে পড়তে বাধ্য হন স্ত্রীকন্যাকে নিয়ে। ভাবুন মনের অবস্থা! বড় মেয়ের বিয়ের শুভ বাকদানপর্বটি কীরকম পরিস্থিতির মুখে পড়েছিল!

পশ্চিমবঙ্গ কোন পথে যাচ্ছে? এ কোন রাজনৈতিক সভ্যতা? 'এ কোন সকাল, রাতের চেয়ে অন্ধকার!'

—প্রশান্ত চক্রবর্তী,
কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি।

আমার সেই দেশ কোথায়

আমার সেই দেশ কোথায়!
ওই বিশাল ভারতবর্ষ কোথায়
যে দেশের শকুনি আর গান্ধারী
মহাভারতের সেই গান্ধার কোথায়!
যেখানে বসবাস করেন শিবশম্ভু
বলো না সেই কৈলাস কোথায়
আমার সেই দেশ কোথায়!
ইতিহাসের সেই আর্যাবর্ত কোথায়
কাটাসরাজের সেই শিবমন্দির
হিংলাজ শক্তিপীঠ কোথায়
হিন্দুকুশের সেই পর্বতমালা
বামিয়ানের বুদ্ধ কোথায়
আমার সেই দেশ কোথায়!
বলো না আমার হিন্দুস্থান কোথায়
বাঘা যতীন আর মাস্টারদা
মেঘনাথ সাহার জন্মস্থান কোথায়
ঢাকেশ্বরী, যশেরেশ্বরী, মা সুগন্ধা
সেই ঢাকা খুলনা চট্টগ্রাম কোথায়
আমার সেই দেশ কোথায়
সেই সোনার পাখি কোথায়
দা গ্রেট ইন্ডিয়া কোথায়
বলো না বলো না বলো না
আমার অখণ্ড ভারতমাতা কোথায়?

—রাজেশ কুমার শ্রীবাস্তব,
বিকে টিটিপি টাউনশিপ, বীরভূম।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এখন প্রায় বিশ্ব জুড়ে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

কথা দিলেন আবির্ভূত হবেন তিনি মর্ত্যধামে। হরণ করবেন পৃথিবীর পাপভার। দমন করবেন দুষ্কৃতীদের। প্রতিষ্ঠা করবেন ধর্মকে। কবে তাও জানিয়ে দিলেন দেবী মহামায়াকে। দেবী যোগনিদ্রা— বিষ্ণুর মহামায়া যিনি তাঁকেই বললেন। ঘন বর্ষায়, ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমীর গভীর রাতে মথুরায় কংসের কারাগারে আবির্ভূত হবেন তিনি। আর পরদিন কৃষ্ণা নবমীতে যোগমায়া জন্ম নেবেন গোকুলে যশোদার কন্যারূপে।

বসুদেব নবজাত কৃষ্ণকে রেখে আসবেন নন্দালয়ে যশোদার পাশে। নিয়ে আসবেন কন্যারূপী যোগমায়াকে। কংস যখন তাঁকে পাষাণে নিক্ষেপ করবেন হত্যার উদ্দেশ্যে, তখনই তিনি হবেন অন্তরীক্ষে অন্তর্হিতা। সেখানে ইন্দ্র তাঁকে গ্রহণ করবেন ভগিনী হিসেবে।

কংস-কারাগারে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের জন্মতিথিটিই পালন করেন সকলে জন্মাষ্টমী হিসেবে। কিন্তু গোল বাঁধিয়েছে একটি উক্তি,—

শ্রাবণে বা নভস্যে বা রোহিণীসাহিতাষ্টমী।
যদা কৃষ্ণা নরৈর্লব্ধা সা জয়ন্তীতি কীর্তিতা।।

ভবিষ্য পুরাণের এই উক্তির অর্থ, শ্রাবণ বা ভাদ্রের রোহিণীনক্ষত্র যুক্ত কৃষ্ণাষ্টমীর নাম জয়ন্তী। অতি প্রশস্ত এই জয়ন্তী যোগে দেবকীনন্দনের প্রীতির জন্য কৃষ্ণভজন এবং ব্রত উপবাস করা কর্তব্য। এই ব্রত পালন করলে কৃষ্ণের প্রীতি জন্মায়। আর এ ব্রত পালন না করলে নরকভোগ করতে হয়। এক আধদিন নয়, ১৪ তম ইন্দ্রের শাসনকাল পর্যন্ত।

শ্রাবণ বা ভাদ্র বলায় সংশয় একটা দেখা দিতেই পারে। কিন্তু একটু ভালো ভাবে লক্ষ্য করলেই দূর হবে ওই সংশয়। দেখা যাবে একটা নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তিথিতেই হয় জন্মাষ্টমী। এখানে শ্রাবণ বলতে শ্রাবণের মুখ্যচান্দ্র মাস এবং ভাদ্রের গৌণ চান্দ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই সাধারণ গণনায়, ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীই জন্মাষ্টমী।

শ্রীকৃষ্ণের এই জন্মতিথিটি সকলেই যে একই দিনে পালন করেন, তা কিন্তু নয়। স্মার্ত মতে জন্মাষ্টমী পালিত হয় কৃষ্ণাষ্টমীতেই। গোস্বামী মতে অর্থাৎ বৈষ্ণবীয় স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী অষ্টমীর রাতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হলেও সকলে সেকথা জানতে পারেন পরদিন নবমী তিথিতে। আর সে কারণেই বৈষ্ণব মতে জন্মাষ্টমী পালন করা হয় পরদিন। সেই দিনই হয় শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা। মহোৎসব।

পরম্পরা

কীভাবে পালন করা হবে এই জন্মাষ্টমী ব্রত? কোনদিনই বা পালন করা হবে সেটি? ভবিষ্যপুরাণে তার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, ব্রত পালনের সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীর অর্ধরাত্র কাল। বলা হয়েছে, ওই সময় যদি বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হয় তাহলে তিন জন্মের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

শিল্পী : রামকিঙ্কর বেজ

আর রাত্রির আগের বা পরের যে অর্ধ জয়ন্তী অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হয় সেটাই হয় ব্রত পালন বা দেব অর্চনার সবচেয়ে প্রশস্ত সময়। তবে সবচেয়ে ভালো সময়ের কথা বলা আছে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। সেখানে আছে, যদি রাতের কোনও অর্ধই রোহিণীযুক্ত অষ্টমী না হয় এবং সূর্যোদয়ের সময় যদি অল্প সময়ও রোহিণীযুক্ত অষ্টমী হয় এবং তারপর সারাদিনই নবমী থাকে, আর দিনটি যদি হয় বুধবার, তাহলে তার চেয়ে ভালো দিন আর হতেই পারে না। এমন সময় একশো বছরে একবার আসে কিনা সন্দেহ।

জন্মাষ্টমীর ব্রত ও উপবাসের দিন হিসেবে চিহ্নিত করার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। আগের রাতে রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত অষ্টমী শুরু হলেও পরের দিনও যদি অবস্থান থাকে তাহলে ওই দিনটিতেই উপবাস এবং ব্রত পালন করতে হয়। এই কথা বলা হয়েছে স্কন্দ পুরাণে। উপবাসের পরদিন তিথি ও নক্ষত্রের অবসানে পারণ করতে হয়। আর ব্রতের আগের দিন পালন করতে হয় সংযম। পরদিন সকালে স্নান করে নিত্যকর্ম পালনের পর বিষ্ণুপূজা করতে হয়। পূজার শেষে শোনা হয় জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা। ব্রতকথাটি সংস্কৃতেই রচিত। সেটি রয়েছে ভবিষ্যপুরাণে।

রাজা দিলীপের প্রশ্নের উত্তরে ব্রতকথাটি শোনান মহর্ষি বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ বলেন : 'দ্বাপর যুগে মথুরার রাজা কংস এবং তাঁর অনুচরদের অত্যাচারে শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীও হয় প্রপীড়িতা। পাপ ভার অসহ্য হওয়ায় পৃথিবী কাঁদতে কাঁদতে যান মহেশ্বরের কাছে। প্রার্থনা করেন প্রতিকারের। অসহায় মহেশ্বর তখন ব্রহ্মা এবং দেবতাদের নিয়ে

যান ক্ষীরোদ সাগরতীরে। সেখানে ভগবান বিষ্ণু তখন শেষ নাগের শয্যায় রয়েছেন ঘুমিয়ে। সকলে মিলে ভগবান বিষ্ণুর স্তুতি করতে থাকলে ঘুম ভাঙে বিষ্ণুর। ব্রহ্মা এবং অন্যান্যদের মুখে সব শুনে তাঁদের প্রার্থনায় কংস বধের জন্য তিনি দেবকীপুত্র কৃষ্ণ হয়ে ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে আবির্ভূত হবেন বলে কথা দেন। সেই কথা মতোই কংস-কারাগারে তাঁর আবির্ভাব। গোকুলে নন্দালয়ে বেড়ে ওঠা। সেখানে তাঁকে হত্যা করার জন্য কংস-প্রেরিত পুতনা এবং অন্য অসুরদের অবহেলায় বধ করেন তিনি। সব শেষে মথুরায় এসে কংসকে নিহত করেন শ্রীকৃষ্ণ।' এই ভাবে জন্মাষ্টমী ব্রতকথা শুনিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন, এই ব্রত পালনকারীরা সর্বদাই শ্রীহরির কৃপা পান।

বঙ্গদেশ-সহ সারা ভারতেই কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এবং তার পরদিন নন্দোৎসব পালন করা হয়। নন্দোৎসবের নৈবেদ্যের প্রধান উপাচার হলো তালের বড়া। প্রচলিত ছড়ায় আছে পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে 'তালের বড়া খেয়ে নন্দ নাচিতে লাগিল।'

ব্রজধামে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিরাট উৎসব হয়। দোলের পর মথুরা বৃন্দাবনে এটাই যে সবচেয়ে বড়ো উৎসব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মথুরা-বৃন্দাবন ছাড়া অসম, মণিপুর, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ-সহ সারা ভারতেই পালিত হয় এই জন্মাষ্টমী উৎসব। উৎসবের অন্যতম অঙ্গ রাত্রি জাগরণ। তারই জন্য আয়োজন করা হয় কৃষ্ণলীলা কীর্তন, ভক্তিগীতি, নৃত্যনাট্য, মঞ্চনাট্য ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গে গত শতকের ছয় সাতের দশক পর্যন্ত সারারাত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং নাটক পরিবেশন করা হোত। মঞ্চগুলি এই উপলক্ষে অনেক সময়ই 'কম্বিনেশন নাইট' অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা- অভিনেত্রীদের নিয়ে নাটক পরিবেশনের আয়োজন করা হোত। এখন অবশ্য এই রেওয়াজ আর নেই। তবে কোথাও কোথাও স্থানীয় ভাবে গানবাজনা বা সখের যাত্রা-নাটক ইত্যাদির আসর বসানো হয়।

ভারতের সর্বত্র অবশ্য দিনটি জন্মাষ্টমী নামে পালিত হয় না। যেমন মহারাষ্ট্রে এই উৎসবের নাম গোকুল অষ্টমী। উৎসবের অন্যতম অঙ্গ 'দহি হান্ডি'। অনেক উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা দইয়ের হাঁড়ি নামিয়ে তা খাওয়া কিশোর-যুবকদের এক মস্ত খেলা। গুজরাট-রাজস্থানে এটি 'মাখন হান্ডি' নামে পরিচিত। জম্মুতে এই উৎসবের অঙ্গ হলো ঘুড়ি ওড়ানো। ওড়িশায় এই উৎসবের নাম শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী অথবা শুধুই শ্রীজয়ন্তী।

ভারত ছাড়া নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ফিজি প্রভৃতি দেশেও জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়। ফিজিতে এই দিনটির নাম 'কৃষ্ণ-অষ্টমী'। গায়না, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, জামাইকা, সুরিনাম প্রভৃতি দেশেও রীতিমতো সমারোহের সঙ্গেই জন্মাষ্টমী পালিত হয়। বিশ্বের যেসব জায়গায় ইসকনের শাখা ও মন্দির রয়েছে সেখানেই উদ্‌যাপিত হয় জন্মাষ্টমী উৎসব।

সব মিলিয়ে বলা যায় জন্মাষ্টমী সারা বিশ্বেরই এক অন্যতম উৎসব হয়ে উঠেছে। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে এক সুন্দর সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

একদিন মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের প্রতি।
সবিনয়ে প্রশ্ন করে দিলীপ ভূপতি।।
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমী তিথিতে।
কেন কৃষ্ণ জন্ম নিল এই ধরণীতে।।
মুনি বলে কংস নামে ছিল নরপতি।
তার অত্যাচারে হইল পীড়িত বসুমতী।।
অপমানে বসুমতী সহ দেবগণে।
চলিল যথায় বিষ্ণু অনন্ত শয়নে।।
বন্দনা করিয়া তবে কহে চতুরানন।
অবধান কর প্রভু তুমি নারায়ণ।।
শিব-বরে অবনীতে কংস দুর্জ্জন।
সুরাসুর নাগ নরে করিছে তাড়ন।।
দেবকীর গর্ভে জন্মি ভাগিনেয় রূপে।
বধ কর দেব তুমি কংসাসুর নৃপে।।
তবে নারায়ণ কহে শুন পশুপতি।
জন্ম লব অবনীতে সহিত পার্ব্বতী।।
বর্ষমাত্র বাকি আসিবেক তব পাশে।
জন্ম নিবে দেবী দেব-কার্যের উদ্দেশে।।
দেবকী জঠরে জন্ম নিল রমাপতি।
যশোধার উদরে জন্মেন পার্ব্বতী।।

অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

রূপশ্রী দত্ত

'প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার'--- নামটি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভের মতোই বিদ্যমান। অগ্নিযুগের এই অগ্নিকন্যা আমাদের সকলেরই নমস্যা। ১৯১১ সালের ৫ মে, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের ধলহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কেরানি ছিলেন। প্রীতিলতার মায়ের নাম প্রতিভাময়ী দেবী। প্রীতিলতারা ছিলেন ছয় ভাই বোন। তাঁদের আদি পদবি 'দাশগুপ্ত'। প্রীতিলতার কোনও এক পূর্বপুরুষ 'ওয়াদ্দেদার' উপাধি পান। সেই থেকে তাঁরা সেই উপাধিকেই পদবির মতো ব্যবহার করতেন।

পিতা জগবন্ধু ছেলেমেয়েদের যথোচিত সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। তিনি প্রীতিলতাকে ডাঃ খাস্তগীর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুলে' ভর্তি করে দেন। প্রীতিলতা মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের অত্যন্ত প্রিয় ঊষাদি বলে এক শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার জন্য ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের কাহিনি গল্পের মতো করে শোনাতেন।

শিল্প ও সাহিত্য প্রীতিলতার প্রিয় বিষয় ছিল। ১৯২৮ সালে তিনি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯ সালে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েটে তিনি ঢাকা বোর্ডের সব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম হলেন। পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্মও তিনি করছিলেন। তিনি শ্রী সঙ্ঘ বা দীপালি সঙ্ঘে যোগদান করেছিলেন। যার নেত্রী ছিলেন লীলা নাগ।

প্রীতিলতা ও বীণা দাশ উভয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরই বিএ ডিগ্রি, ব্রিটিশ সরকার আটকে রেখেছিল। মৃত্যুর সুদীর্ঘ আশি বছর পরে (প্রীতিলতার মৃত্যু ১৯৩২ সালে) প্রীতিলতাকে মরণোত্তর বিএ ডিগ্রি প্রদান করা। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করেছিলেন। তারপর কিছুদিন একটি স্থলে শিক্ষকতা করেন। এরপর, চট্টগ্রামের নন্দনকানন অভয়াচরণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবেও কিছুদিন কাজ করেন।

প্রীতিলতা এবার বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এই দলের সদস্য সংখ্যা ছিল পনেরো জন। দলের নেতা ছিলেন সূর্য সেন। তিনি শিক্ষকতা করতেন বলে, 'মাস্টারদা' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৯৩২ সালে সূর্য সেন চট্টগ্রামের পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। প্রীতিলতা ইতিমধ্যে কিছু অস্ত্রশিক্ষা করেন। তাই অত্যাচারী ইংরেজ আক্রমণকারী দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রীতিলতার পরনে ছিল পঞ্জাবি পুরুষের ছদ্মবেশ। তাঁর দলের অন্য ব্যক্তিরা ধুতি, শার্ট, লুঙ্গি পরিধান করেছিলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, সকাল পৌনে এগারোটায় প্রীতিলতার নেতৃত্বে দলটি পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে পৌঁছোয়। ক্লাবে তখন ৪০ জন ইংরেজ নাচ-গানে মত্ত ছিল। বিপ্লবীরা তিনটি পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করেন ক্লাব। ক্লাবে রিভলবার-সহ পুলিশ অফিসাররাও ছিল। পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবের প্রবেশপথে লেখা ছিল— 'কুকুরদের ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ'। ভারতীয়দের প্রতি এ জাতীয় ঘৃণা ও অবজ্ঞা বিপ্লবীদের অসহনীয় ছিল।

বিপ্লবীরা ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। গ্রেপ্তার এড়াতে প্রীতিলতা তাঁর সঙ্গে রাখা সায়ানাইড পিল খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

প্রীতিলতা শহিদ হলেন। কিন্তু এই দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, নারী-বিপ্লবী চিরন্তন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে রইলেন দেশবাসীর অন্তরে। স্বাধীনতা লাভ করেছি আমরা সত্তর বছর আগে। তারও পনেরো বছর আগে, ২১ বছরের যে সদ্য-তরুণী পরাধীনতার যন্ত্রণা ও দেশপ্রেমের সুগভীর আবেগ নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, প্রাণ দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত হননি, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিকরা যেন সেই ত্যাগস্বীকারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারি।

বাংলাদেশের সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন প্রীতিলতাকে নারীজাতির আদর্শ বলেছেন। প্রীতিলতার স্মরণে 'বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট' গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতে এই ট্রাস্টের উদ্যোগে প্রীতিলতার জন্মদিন পালিত হয়। চট্টগ্রামে প্রীতিলতার নামে রাস্তা আছে।

২০১২ সালে পাহাড়তলি ইউরোপীয়ান ক্লাব সংলগ্ন পাহাড়তলি রেলওয়ে স্থলের সামনে প্রীতিলতার ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রীতিলতা হল' স্থাপিত হয়। ২০১০ সালে প্রীতিলতার জীবনীচিত্র 'খেলে হাম জী জান্ সে' নির্মিত হয় বলিউডে। নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রীতিলতাকে চিরস্মরণীয় করে রাখেন নায়িকা বিশাখা সিংহ। ▮

তেরো বছরের হসমিতার সচেতনতা

সুতপা বসাক ভড়

১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। তখন থেকেই দেশের উন্নতিকল্পে নানান প্রকল্প এসেছে, সেগুলি রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি কতটা সফল হয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন এখনও করে ওঠা হয়নি। মোদী সরকারের তিন বছরের কার্যকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হলো নারীর ক্ষমতায়ণ। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যার জন্য এমন আন্তরিক এবং সক্রিয়ভাবে পূর্ববর্তী কোনো সরকার কাজ করেছে কিনা সন্দেহ। ফলস্বরূপ, দেশের নারীদের মধ্যে সচেতনতা এসেছে। বালিকা-কিশোরী-যুবতী- প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা সবার মধ্যে এসেছে এই সচেতনতা। তারা উপলব্ধি করছে যে, দেশের উন্নতিকল্পে তাদেরও সক্রিয় ভূমিকা আছে। এই আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই, পঞ্জাবের সপ্তমশ্রেণীর ছাত্রী হসমিতার মধ্যে।

পঞ্জাবের মনৌরে বসবাসকারী তেরো বছরের হসমিতা পাতিয়ালার সেন্ট মেরি স্কুলে পড়াশুনা করে। কয়েকদিন আগে সে দিল্লি বেড়াতে গিয়েছিল। রাজঘাটে পৌঁছে সেখানে জুতো-চপ্পল রাখার জন্য দুটো কাউন্টার দেখে। এর মধ্যে একটি ছিল সশুল্ক, অপরটি নিঃশুল্ক। সশুল্ক কাউন্টার মাত্র এক টাকার। কিন্তু কাউন্টারে নিযুক্ত কর্মচারীরা বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে জুতো রাখার জন্য একশো টাকা করে নিচ্ছিল। এই দেখে হাসমিতার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। পাতিয়ালা ফেরার সময় সে ভাবছিল যে, এতে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আমাদের দেশের সম্পর্কে ধারণা খারাপ হচ্ছে। বাইরের লোক বলে তাদের ঠকানো হচ্ছে। হাসমিতা ঠিক করল যে, সে সবকিছু জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখবে।

এদিকে সে জানত না যে, চিঠি কোন ঠিকানায় পাঠাতে হবে। শেষে, প্রধানমন্ত্রীকে সবকিছু জানিয়ে চিঠি লিখে তা খামে ভরে, খামের ওপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, নতুন দিল্লি লিখে তা পোস্ট করে দেয়।

তার এইটুকু প্রায়শই যথেষ্ট ছিল। যথাসময়ে চিঠি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পৌঁছে যায়। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজঘাট সমাধি সমিতিকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। এর ফলে রাজঘাটে পৃথক পৃথক কাজে নিযুক্ত তিনশোর বেশি পুরানো কর্মচারীকে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো কাজের রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে, পুরানো কর্মচারীদের সরিয়ে দেওয়া ছাড়াও সেখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।

রাজঘাটের গান্ধী স্মৃতি দর্শন সমিতির প্রশাসনিক প্রধান এস এ জামাল ১৯ জুলাই এক আদেশ জারি করে আধিকারিক এবং কর্মচারীদের দায়িত্বের সঙ্গে নিজ নিজ কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজঘাটে নিযুক্ত ওই অসৎ কর্মচারীদের এই ধরনের কাজ খুবই দুর্ভাগ্যজনক। গান্ধীজীর সমাধিতে তাঁকে প্রণাম করতে আসা বিদেশি পর্যটকদের থেকে ওখানকার কর্মচারীরা অবৈধ ভাবে বেশি অর্থ নিচ্ছিল। অনেকেই হয়তো এই দৃশ্য দেখেছেন, তাঁদেরও মন খারাপ হয়েছে, অথচ এর প্রতিকারের উপায় মাথায় আসেনি। অথচ, তেরো বছরের হসমিতার বেশি দেরি হয়নি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। সে তার দেখা ঘটনা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দায়িত্বশীলতার কাজ করেছে। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তার এই প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট অধিকারিকেরা রাজঘাটে পৌঁছে সবকিছু দেখাশুনা করে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন।

এই ঘটনায় দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে সচেতনতা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে, তা প্রমাণ হয়েছে। ছোট্ট মেয়ে হসমিতাও সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে— কোন্‌টা ঠিক এবং কোনটা ভুল। সে এই ভুল সংশোধনের জন্য যোগ্য ব্যক্তির কাছেই আবেদন জানায়। দেশের প্রধানমন্ত্রী যে জনগণেরই প্রতিনিধি সে অনুভব করেছে। সেজন্য বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছে এবং তার এই প্রত্যাশাপূরণে সার্থক ভূমিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ▮

গান্ধী বনাম গান্ধী

স্বাধীন ভারতের গৌরবজনক সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবভারত নির্মাণে আর এক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সত্তর বছরের ক্রান্তিকালে, প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও একদিকে যেমন আমাদের রাষ্ট্রীক মূল প্রতিজ্ঞার অবক্ষয় ঘটেছে; তেমনি আমাদের সামাজিক প্রতিশ্রুতি-পালনের অভাবে প্রগতি ব্যাহত হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী সার্বভৌম, সোশ্যালিস্ট, সেকুলার, গণতান্ত্রিক লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে রাজনীতির সজ্ঞান ব্যভিচারে আমরা ফিউডাল সোশ্যালিস্ট, সিউডো সেকুলার, ডাইন্যাস্টিক ডেমোক্রাসির সামন্ত্রতান্ত্রিক 'প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠায় প্রশ্রয় দিয়েছি।

ফলে সেই রাজা-প্রজার অসম রাজত্বে আমাদের সমাজে যে জাস্টিস, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি ও ফ্রেটারনিটি প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, তা অধরাই রয়ে গেছে। তাই সামাজিক অসাম্য ও অন্যায় প্রবল হয়ে বিকারকে পুঞ্জীভূত করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই অন্ধকারকে দূর করতে মহাত্মা গান্ধীর পথ অনুসরণ করে নতুন এক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, স্বচ্ছ ভারত নির্মাণে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, বেকারি, অশিক্ষা, অপুষ্টি ভারত ছাড়ো। সময়সীমা দিয়েছেন আগামী পাঁচ বছর যাতে স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তীতে আমরা এক অসাম্য মুক্ত ভারতের দেখা পাই।

এতে হয়েছে বিজাতীয় কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটিডের মালকিন ইটালিয়ান গান্ধীর গোঁসা। প্রধানমন্ত্রী খেয়ালের বশে যে-কোনও হঠাও অভিযান করতে পারেন। তাই বলে কংগ্রেস পার্টির সম্পত্তি গান্ধীজীর নাম নেবেন কেন? আসলে এটা পেটেন্ট চুরি করার মতোই গর্হিত। গান্ধী নামের পেটেন্ট একমাত্র অন্য গান্ধীই ব্যবহার করতে পারে। আমরা পারিনি বলে অন্য কেউ আমাদের পয়েন্ট চুরি করবে নাকি!

আসলে সব দেখেশুনে সেই ছেলেবেলার গল্প মনে পড়ে গেল। একজন বক্তা বলার জন্যে তিনটি পয়েন্ট ঠিক করে এসেছিলেন। প্রথম বক্তা তাঁর প্রথম পয়েন্ট নিয়ে বললেন, দ্বিতীয় জন দ্বিতীয় পয়েন্ট এবং তারপর যেই তৃতীয়জন তাঁর তৃতীয় পয়েন্ট নিয়ে বলতে আরম্ভ করেছিল, ওমনি তিনি লাফিয়ে উঠে, ওটা আমার পয়েন্ট বলে তাঁর জামা ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। আমাদের বিজাতীয় কংগ্রেসের হয়েছে সেই দশা; গান্ধী পয়েন্টটা নাকি তাঁদের নিজস্ব। সুতরাং সেটা ব্যবহার করার মতো তাঁদের ঘটে বুদ্ধি না থাকলেও অন্য লোকের তা ব্যবহার করার অধিকার থাকতে পারে না। অতিশয় হক কথা!

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পরই গান্ধীজীকে আইকন করে কাজ করছেন বলে অনেকেরই গাত্রদাহ প্রবল। কেননা তিনি নাকি গান্ধী নামধারী কংগ্রেস পার্টির পারিবারিক সম্পত্তি। গান্ধীজী যদিও নিজে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যও ছিলেন না এবং স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর শিষ্য, ভারতমুর্খ ব্রিটিশ বকচ্ছপ চিন্তার নেহরুসাহেব গান্ধীজীর দেশ গঠনের সমস্ত চিন্তাভাবনা ভারত মহাসাগরে জলাঞ্জলি দিয়ে রাজঘাটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে কর্তব্য সমাধা করেছিলেন। তারপর থেকে গান্ধীবর্জিত সেই নেহরু সর্বস্বতাই উত্তরকাণ্ডের কংগ্রেসি জমানার অনুসৃত নীতি হয়ে এসেছে।

গান্ধীজীকে সজ্ঞানে ও সপ্রাণে তিলে তিলে হত্যা করেছে তাঁর নামাবলি গায়ে দেওয়া মহান নেহরু সম্প্রদায়। শুধু তাঁকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসি সভায় দেশভাগের সিদ্ধান্ত নেওয়াই নয়, গান্ধীজীর গ্রামস্বরাজ, স্বনির্ভর প্রকল্প, জনগণতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ভাবনাই কংগ্রেসি সরকার- পরম্পরা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু গান্ধীকে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানামার অভ্যাস তারা বন্ধ করতে পারেনি।

গান্ধীজী যুক্তিযুক্তভাবেই চেয়েছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে, কিন্তু বাদশাহি করার লোভে তদানীন্তন কংগ্রেসি মাতব্বররা তাতে কর্ণপাত করেননি। কংগ্রেস ছিল সর্বদল সমন্বয়ে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চ; সেখানে ভিন্ন ভিন্ন মত ও দলনির্বিশেষে সকলে স্বাধীনতার লক্ষ্যে সংগ্রামে একত্র হয়েছিল। এমনকী পাকিস্তানের দাবিতে থিসিস ঝাড়া, জনযুদ্ধের ব্রিটিশ দোসর এবং আগস্ট বিপ্লবের পিঠে ছুরি মারা বামপন্থীরাও শামিল ছিল।

বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নামগ্রহণে, যে কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটেডের এত আপত্তি, তারা জেনে রাখলে ভালো যে, বিয়াল্লিশের বিপ্লব সার্থক করেছিল আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি। কেননা মূল কংগ্রেসের নেতারা তখন জেলে গিয়ে ব্রিটিশ প্রোটেকশনে নিরাপদে খোয়াব দেখতে ব্যস্ত। এমনকী কংগ্রেসের বাইরে থাকা আর এস এসেরও এই সূত্রে ব্রিটিশরাজের নজরে থাকার কথা অগোচর নয়। আমাদের ইটালিয়ান গান্ধী এবং তাঁর পারিষদবর্গের অবশ্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে মহান ঐতিহ্য আছে, ঠাকুরদাদার হাতে ঘি খাওয়ার সুবাদে।

কিন্তু যে কংগ্রেসের ঐতিহ্য নিয়ে এই বিজাতীয় কংগ্রেসের ইটালিয়ান গান্ধী ও তাঁকে কুর্নিশ করা হাঞ্চব্যাক কংগ্রেসিরা দিনরাত সরব, তাঁরা জেনে রাখলে ভালো

যে এই কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নয় এবং এই গান্ধীও সেই গান্ধী নয়। গান্ধীজীর একটিও কর্মপ্রকল্প মহাদিগ্‌গজ নেহরু না আমল দিলেও, তস্য তনয়া ইন্দিরা কিন্তু তাঁর একটি অপূর্ণ আশা পূরণ করেছিলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, ইন্দিরা ক্ষমতায় এসেই সেই কংগ্রেসকে ভেঙে দু' টুকরো করেছিলেন, যা পরে টুকরো টুকরো হয়ে এখন বর্তমান অবস্থায়। একদিনের বেগবতী নদী যেমন মরুপথে পথ হারিয়ে মাঝে মাঝে বদ্ধ জলাশয়ে আবদ্ধ হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, ঠিক তেমনই।

গান্ধীজীর রাজনীতির মূল কথা ছিল তার নৈতিকতা এবং বিশ্বরাজনীতিতে তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো, ম্যাকিয়াভেলির বিপরীতে তঞ্চকতাপূর্ণ রাজনীতিতে মরালিটি বা নৈতিকতার অবস্থানকে চূড়ান্ত করা এবং means ও Ends-কে ন্যায়নীতির সমসূত্রে গ্রথিত করা। ভারতে পরীক্ষিত গান্ধীজীর এই প্রয়াসকে এক ঝটকায় নস্যাৎ করে দিলেন ইন্দিরা মহিমময়ী। তাঁর প্রস্তাবিত প্রেসিডেন্ট পদে কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির বিরোধিতা করে তিনি Conscience ভোটের নামে নির্লজ্জভাবে Conscience নিধনের কাজে নেমে পড়লেন। এই অনৈতিক কাজ করে, অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে, প্রথমে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙে করলেন কংগ্রেস (আর) এবং তারপর সুবিধেমতো সেটাকে ভেঙে করলেন কংগ্রেস (আই) এবং জাতীয় কংগ্রেসের বদলে মহান ডাইন্যাসটিক ডেমোক্রাসির কংগ্রেস (গান্ধী) প্রাইভেট লিমিটেড। এবার মহাত্মা গান্ধী পরম্পরায় এল মেকি গান্ধীরা, ইন্ডিয়া গান্ধী, বোফর্স গান্ধী, দুরাত্মা গান্ধী, ইটালিয়ান গান্ধী এবং বর্তমানের অপোগণ্ড গান্ধী। এই Low বুদ্ধির কংগ্রেসি হাইকম্যান্ড ও তার Lowly চাটুকারবৃন্দের সুযোগ্য নেতৃত্বে যে জাতীয় কংগ্রেস একদিন সেবা দলের মাধ্যমে ভারতের প্রত্যন্ত প্রান্ত অবধি সুবিস্তৃত ছিল, তা আজ মহামতি অপোগণ্ড গান্ধীর নেতৃত্বে ভেকের কলরবে মুখরিত 'জনপথ কূপে' পরিণত।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রধান কৃতিত্ব হলো, এই অপোগণ্ড নেতৃত্বের সর্বনাশা হাত থেকে দেশকে পরিত্রাণ করা। তারপরে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব হলো, নেহরুভিয়ান ননসেনসের তলায় চাপা পড়া ভারতীয় ভাবধারার নেতা মহাত্মা গান্ধীকে উদ্ধার করে তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। মহাত্মাজীর চশমা লোগো করে যে স্বচ্ছভারত অভিযান আরম্ভ হয়েছে, তা যেমন যুগোপযোগী তেমনি জাতির পক্ষে প্রাণপ্রদ। দেশকে ক্লেদমুক্ত ও বিভেদমুক্ত করতে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ জাতির উদ্দেশে ডাক দিয়েছিলেন, 'কটিমাত্র বস্ত্রপরিহিত হয়ে সদর্পে বল, দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার রক্ত আমার ভাই'। সেকথা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু একমাত্র গান্ধীজীই কটিমাত্র বস্ত্র পরিহিত হয়ে অচ্ছুত কলোনিতে হাজির হয়েছেন। জাতিকে এককাতারে নিয়ে এসে ক্লেদমুক্তির হাতেকলমে কাজ করেছেন। নির্মল ভারতের লিপসার্ভিস নয়, স্বচ্ছভারত অভিযানের জন্যে— সেই গান্ধীজীকেই যে চাই, সেকথা বলা বাহুল্য।

তাই গান্ধীজী ছাড়া স্বচ্ছ ভারতের, দুর্নীতিমুক্ত ভারতের, দারিদ্র্যমুক্ত ভারতের, অশিক্ষা মুক্ত ভারতের কোনও প্রতিজ্ঞা হতে পারে না। কংগ্রেসের পরিত্যক্ত নেতা গান্ধীজীকে কংগ্রেসি কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ করে বিজেপি জমানায় দেশের কারেন্সি নোট থেকে তাঁর ছবিকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন বাতুলতা মাত্র। মহাত্মা গান্ধী সর্বজনস্বীকৃত জাতির জনক, তাঁকে জাতের ও পার্টির কবল থেকে উদ্ধার করে নবভারতে নির্মাণের পথপ্রদর্শকরূপে চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। ▮

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা উত্তর-পূর্ব ভাগের প্রাক্তন সঙ্ঘচালক সাধনানন্দ মিশ্রের পত্নী শ্রীমতী মুক্তি মিশ্র দীর্ঘদিন ডিসেনশিয়া ও ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া রোগভোগের পর গত ১১ জানুয়ারি তাঁর বাসভবন বি-৩৭/২, কালিন্দী হাউসিং এস্টেটে পরলোকগমন করেছেন। তাঁর দুই কন্যা, দুই জামাতা ও নাতি-নাতনী রয়েছে। তাঁর বাড়িটি সঙ্ঘকাজের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার সারদাপল্লীর সদানন্দ গোস্বামী গত ২৮ জুলাই পরলোকগমন করেছেন। তিনি ব্যারাকপুর জেলা কার্যকারিণীর সদস্য ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

গত ১০ জুলাই মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর সহধর্মিণী যুথিকা লাহিড়ী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্বামী, এক কন্যা, জামাতা ও নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার কাঞ্চনতার শাখার স্বয়ংসেবক দীপক রায়ের মাতৃদেবী গত ২০ জুলাই পরলোকগমন করেছেন। তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

গত ১৫ জুলাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর আন্দামান জেলার সুভাষগ্রাম খণ্ড কার্যবাহ নিরঞ্জন মন্ডলের মাতৃদেবী সুরুবালা মন্ডল পরলোকগমন করেছেন। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পলাশি শাখার স্বয়ংসেবক তথা নদীয়া বিভাগ কার্যকারিণীর সদস্য তপন রঞ্জন দে-র মধ্যম ভ্রাতা নিরঞ্জন দে গত ৫ আগস্ট পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

স্বপ্নের পিছনে ধাওয়া করে কৃষক থেকে উদ্যোগপতি

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আয়ুর্বেদে আমলকীকে অমৃতফল বলা হয়েছে। এর কারণ মানব শরীরের বিবিধ রোগ উপশমে আমলকীর ব্যবহার। সাধারণ সর্দিকাশি থেকে শুরু করে পেটে লিভার এমনকী ত্বকের যত্নেও আমলকী দারুণ কাজ দেয়। এহেন অমৃতফলের চাষে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন রাজস্থানের অমর সিংহ। বাইশ বছর আগে বারোশো টাকায় ষাটটি আমলকীর চারা কিনে জমিতে লাগিয়ে ছিলেন। এখন তার বার্ষিক টার্নওভার ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। সাতান্ন বছর বয়েসী এই স্বশিক্ষিত কৃষক প্রথাগত চাষাবাদের উল্টোদিকে হাঁটার যে সাহস দেখিয়েছেন তা আজ সারা দেশে চর্চার বিষয়।

আমলকী বাগানে অমর সিংহ।

সাফল্যের সোনালি বৃত্তে প্রবেশাধিকার অবশ্য সহজে মেলেনি। বাবা বৃন্দাবন সিংহের অকালমৃত্যু অমরকে বাধ্য করেছিল মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে। বাড়িতে তখন তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন। বিধবা মা। কতকটা তেতো গেলার মতো করে গ্রহণ করেছিলেন বংশপরম্পরায় চলে আসা কৃষকের পেশা। কিন্তু মন পড়ে থাকত অন্য কোথাও। একবার সব ছেড়েছুড়ে অটো কিনলেন। দিনে পাঁচশো টাকা রোজগার। পোষাল না। ১৯৮৪-৮৫ সালে শখের ড্রাইভিং ছেড়ে গুজরাটের আমেদাবাদে স্টুডিয়ো ব্যবসা শুরু করলেন। ওখানে অমরের মামারও একটি স্টুডিয়ো ছিল। তিনি যথাসাধ্য ভাগ্নেকে সাহায্য করতেন। কিন্তু হলে কী হয়, ব্যবসা আর জমে না! ওদিকে রাজস্থানে অমরের মা সোমবতী দেবী তখন সমস্ত জমি ভাগচাষিদের দিয়ে চাষ করাচ্ছিলেন। তারাও সুযোগ পেয়ে অসহায় বিধবাকে দেদার ঠকাচ্ছিল। উপায়ান্তর না পেয়ে ছেলেকে চিঠি লিখলেন সোমবতী। অমর সিংহ ফিরে এলেন। কিন্তু বাপ-ঠাকুর্দার দেখানো রাস্তায় হাঁটতে তার ভালো লাগে না। তিনি নতুন কিছু করতে চান। তাই জমি রইল পড়ে। একটা মহিন্দ্রা ভ্যান কিনে তিনি ভাড়া খাটাতে শুরু করলেন। কিন্তু এও তার ভালো লাগে না। হাড়ভাঙা খাটুনি। তুলনায় রোজগার সামান্য। ঠিক এই সময় তার জীবনে এল একটা অন্যরকম বাঁক। হঠাৎ শুনলে ভোজবাজি বলে মনে হবে কিন্তু ঘটনাটা ষোলোআনা সত্যি। একদিন একটা হিন্দি খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতায় তিনি আমলকী চাষের বিপুল সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেছিলেন। মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বাবার রেখে যাওয়া ২.২ একর জমিতে আমলকী চাষ করলে কেমন হয়?

এর পরের ঘটনাবলী আগাথা ক্রিস্টির থ্রিলারকেও হার মানাবে। প্রথম বছরেই অমর সিংহের সাত লক্ষ টাকা লাভ হয়েছিল। ফলনের বহর দেখে তার মনে হলো খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়া দরকার। নয়তো এত আমলকী সাধারণ বাজারে বিক্রি করা অসম্ভব। যাই হোক, আমলকীর মোরব্বা রাজস্থানে খুবই জনপ্রিয় খাবার। যারা তৈরি করে যোগাযোগ হলো তাদের সঙ্গে। দু'পক্ষের আলোচনায় স্থির হলো অমর সিংহ আমলকীর জোগান দেবেন। দাম পড়বে বড়ো সাইজ ১০ টাকা প্রতি কিলো। মাঝারি এবং ছোট যথাক্রমে ৮ এবং ৫ টাকা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হলো গণ্ডগোল। অমর সিংহ বলেন, 'ওরা বলত আমলকীর সাইজ নাকি স্যাম্পেলে দেখানো সাইজের সঙ্গে মিলছে না। আমার তখন ওদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। দু-তিন বছর এভাবেই চালিয়ে ছিলাম। তারপর ব্যবসা আরও একটু বাড়তে মনে হলো আমার নিজেরই ফুড প্রসেসিং-এর কারখানা থাকা উচিত।'

২০০৫ সালে অমর সেল্ফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করা হলো। নিযুক্ত হলেন ১০ জন মহিলা কর্মী। ওই বছরেই ৭০ কুইন্টাল (৭০০০ কেজি) আমলকী প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রূপান্তরিত হলো মোরব্বায়। গত প্রায় এক দশক ধরে অমর সিংহের 'অমৃত' ব্র্যান্ড এবং এই ব্র্যান্ডের মোরব্বা কুমহের, ভরতপুর, টঙ্ক, ডিগ, মান্তোয়ার অঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে চেনা নাম। এক, দুই এবং পাঁচ কেজির প্যাকেটে পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে ১৯ কেজির টিন। ২০১৫-১৬ সালে ৪০০ কুইন্টাল আমলকী ফলেছে অমর সিংহের জমিতে। এক কথায় যা একটা রেকর্ড।

নতুন কিছু করতে চেয়েছিলেন অমর সিংহ। করতে পেরেছেন। তিনি প্রমাণ করে ছেড়েছেন প্রথাগত কৃষির দিন আর নেই। কৃষককে এখন উদ্যোগপতি হতেই হবে। কারণ মাটি শুধু তার মা নয়, কর্মক্ষেত্রও বটে।

দাঁতের সমস্যা ও হোমিয়োপ্যাথি

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

কথায় বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না মানুষ। দাঁত আমাদের পুষ্টি সাধনে বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করে। আর সুন্দর দাঁত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাধারণত শিশুদের ২০টা দুধের দাঁত আর পরিণত মানুষের ৩২টা স্থায়ী দাঁত থাকে। এর মধ্যে ২৪টা দাঁত ১২-১৩ বছর বয়েসের মধ্যেই ওঠে, বাকি ৪টি দাঁত অর্থাৎ ৩য় মোলার ওঠে ১৮-২৫ বছরের মধ্যে। ওই সময় লেট-টিন এ ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার বিকাশ ঘটে অর্থাৎ ম্যাচিওর হয়। তাই ৩য় মোলার (৪টে দাঁতই) হলো আক্কেল দাঁত।

প্রথম প্রথম আক্কেল দাঁত পুরোটা নাও উঠতে পারে। আদিম যুগে মানুষ কাঁচা মাংস খেত। আদিম যুগের মানুষের মুখের গঠন ছিল অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো, মুখটা সামনের দিকে এগিয়ে থাকত। এখন ৩-৪, ১২টা মোলার বা পেশার দাঁত প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছে। দাঁত ওঠার জায়গাও কমে গিয়েছে। ফলে আক্কেল দাঁত ওঠবার সময় নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি করে। ওপারকুলাইটিস বলে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়।

যেহেতু দাঁতের ওপর মাড়ির অংশটা খানিকটা থাকে তার ফলে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রদাহ হওয়াকেই ডাক্তারি ভাষায় ওপারকুলাইটিস বলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দাঁত ও ওপারকুলারের মধ্যে জমা খাবার পচে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে। এছাড়া পেরিকরোলাইটিস বলেও একটা সমস্যা হয়। আক্কেল দাঁতের ক্রাউনকে ঘিরে থাকা মাড়ির অংশের (হাড় ও চোয়ালের সফট টিস্যু) প্রদাহ যা আশপাশের জায়গাগুলিতে জমতে পারে ও মুখ ফুলিয়ে দেয়। জ্বরও আসে, যন্ত্রণা হয়, কাছাকাছি লিম্ফনডস্ ফুলেও উঠে। এছাড়াও হাড়ের মধ্যে পুরোপুরি থেকে যাওয়া সিস্ট অথবা টিউমার হওয়া অথবা না ওঠা আক্কেল দাঁত থেকে নানারকমের অসুবিধা চোয়ালের হতে পারে অর্থাৎ চোয়ালে সিস্ট হতে পারে।

দাঁতের আর একটি রোগ হলো দাঁতে পোকা। কথাটি সাধারণের কাছে পরিচিত হলেও আসলে এটি পোকা নয়। দাঁতের ক্ষয়রোগে দাঁতের ক্যালসিফায়েড টিস্যু নষ্ট হয় এবং জৈব ও অজৈব অংশ ধ্বংস হয়। এই রোগ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে মানুষের মধ্যে দেখা যায়। দন্তক্ষয়ের কারণ না জানা গেলেও কয়েকটি বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে; যেমন খাদ্যের শর্করা অংশ, কয়েকটা মাইক্রো অরগানিজম (জীবাণু) অম্ল ডেন্টাল প্লাগ ইত্যাদি।

দাঁতের ক্ষয়রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। খাওয়ার পর মুখ ভালো ভাবে ধোয়া এবং সকাল ও রাতে খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করা প্রয়োজন। যাই হোক, এবার আসি দাঁতের রোগের ওষুধ প্রসঙ্গে। কয়েকটি ওষুধের উল্লেখ করছি মাত্র। দাঁতে ব্যথা, ঠাণ্ডা লেগে দাঁত ব্যথা হলে— একোনাইট। মাড়িতে ঘা, দাঁত নড়লে— ক্যালিফস। মাড়ি ফুললে বেলোডোনা। ঠাণ্ডা জল খেলে দাঁতে ব্যথা বাড়লে স্ট্যাফিসাগ্রিয়া। ঠাণ্ডায় যদি যন্ত্রণা কমে তবে ক্যামোমিলা। গরম কিছু খেলে যদি যন্ত্রণা বাড়ে সেক্ষেত্রে ন্যাট্রাম-সালফ। দাঁতে পোকা অথবা দন্তক্ষয়ে প্লান্টানো এবং কিয়োজোট বিশেষ কাজ দেয়। তুলোয় করে দাঁতের গোড়ায় লাগালে উপকার পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে ২০০ শক্তির ওষুধ সেবনে উপকার পাওয়া যায়। দাঁত দিয়ে পুঁজ পড়লে হিপারসালফার এবং এমেটিন ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যাবে। কফিড়া ক্রুড়া দাঁতের একটি ভালো ওষুধ। বাচ্চাদের দাঁত উঠতে দেরি হলে ক্যালকেরিয়া ফস ৩০, যে সময় বাচ্চাদের প্রায়ই পেট খারাপ হয় তাদের ইপিকাক ২০০ দিলে সুস্থ থাকবে।

আর্সেনিক— রোগী অস্থির বেদনা দিন বা রাত দুপুরে বৃদ্ধি তাপে উপশম। ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি তাপে উপশম। ঠাণ্ডাতে বৃদ্ধি দাঁতগুলো শিথিল ও লম্বা হয়েছে অনুভব। তীব্র দাঁতের বেদনায় মহৌষধ ক্যামেমিলা। দাঁতের ওষুধের থেরাপিউটিক্স আক্কেল দাঁত ওঠার সময় যন্ত্রণা— ক্যাল্ক-কার্ব, ম্যাগ-কার্ব, চিত্তন্যানথাস চেরি, সাইলেসিয়া ঠাণ্ডা জলে উপশম— আর্স, লাইকো, মাক, নাক্স, সেরিনাম, রডোরাস, সিলিকা।

ঋতুকালে দন্তশূল আর্স— ক্যামোমিলা, নেট্রামমিউর, পালস, সিপিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড।

ধূমপানে উপশম— মার্ক, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রাম সালফ।

দাঁতে দাঁত ঘষলে উপশম- ফাইটোলোক্কা।

ঠোঁট ঢেকে থাকলে উপশম-নাক্স সিলিকা, ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুলে বৃদ্ধি-সালফার। এছাড়াও আরও অনেক ওষুধ আছে হোমিয়ো শাস্ত্রে, তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ, চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতায় আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন যা চিকিৎসায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ■

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩৬

শব্দরূপ-৮৩৯ শান্তনু গুড়িয়া

■	■	১				২	
৩			■	■	■		■
	■	৪		৫	■		■
৬	৭	■	■		■		■
■		■	৮	■	■	৯	১০
■		■	১১		১২	■	
■		■	■	■	১৩		
১৪						■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

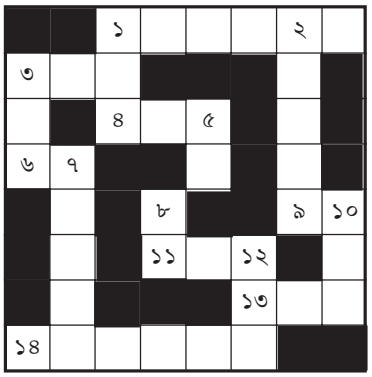

পাশাপাশি : ১. যে সম্যক্ বিবেচনা না করে কাজ করে; হঠকারী, ৩. বৈষ্ণবদের মাধুকরীর ঝুলি, ৪. বিচিত্র বর্ণ; রাক্ষস, ৬. ময়ূরের ডাক, ৯. ''— গাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, সবকিছু ছাড়িয়ে'' ১১. কৃষ্ণসহচর গোপবালক, ১৩. জিহ্বা, ১৪. আয়ুর্বেদোক্ত আসন্ন মৃত্যু-লক্ষণ।

উপর-নীচ : ১. মিথ্যা, অমূলক, ২. উপযোগী, কাজের মতো, ৩. পোষা হস্তিনী যার সাহায্যে খেদায় হাতি ধরা হয়, ৫. লক্ষ্মীদেবী, ৭. শাস্ত্রোক্ত, আদিমবারি যা থেকে জীবের উৎপত্তি হয়েছে, ৮. অষ্ট গণদেবতা, যাঁরা শান্তনু-গঙ্গার পুত্ররূপে জন্মেছিলেন, ১০. কবিকঙ্কনের চণ্ডীতে উল্লিখিত ধনপতি সদাগরের প্রথমা পত্নী, ১২. ''— রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।''

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৬

ক	ল	কা	তা	■	সু	■	গ
■	লি	■	লু	■	কু	চি	লা
মো	তা	বে	ক	■	মা	■	য়
হি	■	■	দা	দু	র	■	গ
নী	■	কু	র	র	■	■	লা
চৌ	■	ব	■	ব	না	শ্র	য়
ধু	স্ব	ল	■	গ	■	মি	■
রি	■	য়	■	ম	দ	ক	ল

সঠিক উত্তরদাতা

মৃণালকান্তি সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগণা
দেবেশ বর্মন, ঘুঘুমারী, কোচবিহার

□ ৮৩৮ সংখ্যার সমাধান পরের সংখ্যায়।

বিষ্ণুপুরের রানি চন্দ্রপ্রভা

বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান বিষ্ণুপুর। সারাভারত যখন মোগলের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিষ্ণুপুর তখনও আপন গরিমায় সমুজ্জ্বল। রাজা রঘুনাথ সিংহের বীরত্ব ও রানি চন্দ্রপ্রভার বাৎসল্য বিষ্ণুপুরকে আগলে রেখেছে। সকালবেলা রাজা-রানি প্রাসাদের অলিন্দে এসে প্রজাদের দেখা দেন। রাজদর্শন করে প্রজারা আনন্দে যে যার কাজে চলে যায়। সন্ধ্যেবেলা কুলদেবতা মদনমোহন মন্দিরে বেজে ওঠে মন্দিরা। রানি নিজে এসে মদনমোহনের সেবা করেন। তিনি এক ভক্তিমতি সাধিকা।

এমন সুখের রাজ্যে একদিন কালোছায়া নেমে এলো। এক ভূস্বামী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। রাজা রঘুনাথ তরবারি উঁচিয়ে গেলেন বিদ্রোহ দমন করতে। রানি চন্দ্রপ্রভা অপেক্ষা করে থাকেন, বিদ্রোহ দমন করে কবে ফিরে আসবেন রঘুনাথ।

খবর এলো শত্রু দমন হয়েছে। বিষ্ণুপুরে শুরু হলো আনন্দ উৎসব। ফিরে এলেন রাজা রঘুনাথ। সঙ্গে নিয়ে এলেন একখানি সুসজ্জিত পালকি। রানি চন্দ্রপ্রভা ভাবলেন, নিশ্চয়ই তার জন্য কোনো উপহার! কিন্তু তা ভুল। রাজা রঘুনাথ এনেছেন একজন নর্তকী। নাম লালবাঈ।

লালবাঈয়ের জন্য নির্মাণ হলো নতুন ভবন। তারপর থেকে রাজা বেশিরভাগ সময় লালবাঈয়ের নতুন ভবনেই থাকেন। সন্ধ্যে হলেই লালবাঈয়ের ভবন থেকে ভেসে আসে নাচ-গানের রব। নৃত্যগীতে মেতে ওঠেন রাজা রঘুনাথ। প্রজাদের কথা ভুলে গেলেন।

রাজা আসেন না কুলদেবতা মদনমোহন মন্দিরে। সকালবেলা দেখা দেন না প্রজাদের। নিষ্ঠাবান রানি কেবল নিজের কর্তব্য পালন করে যান আর ঠাকুর মদনমোহনকে ডাকেন।

এমন করে বেশিদিন চলে না। লালবাঈয়ের চক্রান্তে অত্যাচারী হয়ে ওঠেন রাজা রঘুনাথ। প্রজাদের আর সুখ নেই। মন্ত্রী, সেনাপতি সবাই চিন্তিত। অরাজকতার কালোছায়া নেমে এলো বিষ্ণুপুরে।

একদিন সংবাদ এলো রাজা ধর্ম ত্যাগ করছেন। তার আয়োজন চলছে। রানি চন্দ্রপ্রভা লুটিয়ে পড়লেন মদনমোহনের পায়ে। বিষ্ণুপুরের একী দুর্ভাগ্য, রাজা ধর্মচ্যুত হচ্ছেন! বিষ্ণুপুরের এই অপমান সহ্য করা যায় না। লালবাঈয়ের ষড়যন্ত্রে রাজার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তিনি আপন গৌরবের কথা ভুলে গেছেন। রাজ কর্তব্যের কথা ভুলে গেছেন। রানি চন্দ্রপ্রভার দু-চোখ জ্বলে উঠল। বিষ্ণুপুরের ধর্ম, গৌরব এভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যেতে পারে না।

প্রাসাদে ফিরে এসে তিনি রক্তবর্ণ পরিধান করলেন। জ্বাললেন মঙ্গলদীপ। তারপর ডেকে পাঠালেন মন্ত্রীকে।

মন্ত্রী বললেন, রানিমা বিষ্ণুপুরের এই অপমান সহ্য করা যায় না। আপনি পথ দেখান।

রানি চন্দ্রপ্রভার আদেশে কয়েকজন সেনা নিয়ে মন্ত্রী হাজির হলেন লালবাঈয়ের নতুন ভবনে। সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন রাজা রঘুনাথ ও লালবাঈ। শেষ করে দেওয়া হলো দু'জনকেই।

রানির চোখে জল নেই। কোনো অনুতাপ নেই। বিষ্ণুপুরের সম্মান রক্ষার অঙ্গীকার আজ তাঁর চোখে। লালবাঈকে নিক্ষেপ করা হলো লালবাঁধের জলে। তারপর স্বামীর চিতায় উঠে বসলেন রানি। মৃত রাজার জন্য সজ্জিত হলো চন্দনকাঠের চিতা। নববধূর বেশে রানি চন্দ্রপ্রভা। বললেন— বিষ্ণুপুরের সম্মান রক্ষার জন্য আমিই রাজাকে হত্যা করেছি। কিন্তু তিনি আমার স্বামী, তাঁর চিতায় সহমরণের অধিকার আমার কাছে। বিষ্ণুপুরের সম্মান রক্ষা করে পতির চিতায় সহমরণ বরণ করলেন রানি চন্দ্রপ্রভা।

ভারতের পথে পথে

বাগবাজার

কলকাতার উত্তরে একটি অঞ্চল বাগবাজার। বাংলার নবজাগরণ তথা ইতিহাসের নানা উত্থান পতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এই বাগবাজার। এক সময় সুতানুটি গ্রামের অন্তর্গত ছিল এটি। তারপর ধীরে ধীরে এখানে ইংরেজ কর্তৃত্ব আসে। এই বাগবাজারের কাছেই ঘটে সিরাজ ও ইংরেজের যুদ্ধ। বিশিষ্ট নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার বাস ছিল এখানে। শ্রীশ্রী সারদা মা ও ভগিনী নিবেদিতার বাসস্থান এখানে। আধুনিক বাংলার বহু স্মৃতি ধরে রেখেছে কলকাতার বাগবাজার অঞ্চল।

এসো সংস্কৃত শিখি

ভবন্তঃ কতি সহোদরাঃ ?
তোমরা কজন ভাই?
বয়ম্ আহত্য অষ্ট জনাঃ।
আমরা মোট আট জন।
তেষু ভবন্ কতমঃ ?
ওদের মধ্যে তুমি কোন জন?
ভবান্ এব জ্যেষ্ঠঃ কিম্ ?
তুমিই কি বড়?
মম একঃ অনুজঃ অস্তি।
আমার একজন ছোট ভাই আছে।

ভালো কথা

অতি চালাকের গলায় দড়ি

আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলে দীপু। সে প্রতিদিন ক্লাসে নানা দুষ্টুমি করে। বিশেষ করে রমেশের সঙ্গে। নানা ফন্দি করে রমেশকে ফাঁসানোর। একদিন অঙ্ক স্যারের ক্লাসে ঘটল এক অঘটন। স্যার বোর্ডে অঙ্ক বোঝাচ্ছেন। সবার পিছনের বেঞ্চে বসে দীপু। সে অনেকগুলি কলমের ক্যাপ নিয়ে এসেছে। সুযোগ পেলেই ছুড়ে মারছে দীপুর মাথায়। এমনি একটি ক্যাপ গিয়ে লাগলো স্যারের মাথায়। স্যার ভীষণ রেগে গেলেন। হেডস্যার ডেকে পাঠালেন দীপুর বাবা-মাকে। ছেলের দুষ্টুমির কথা বললেন। সেদিন জব্দ হলো দীপু।

মৌনব দাস, ষষ্ঠ শ্রেণী, তারক প্রামাণিক রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

রাখিবন্ধন

জীবন সওদাগর, দ্বাদশ শ্রেণী, নওদা, মুর্শিদাবাদ

মন খুশি হলো হাঁটাপথ বেয়ে
রাখি উৎসবে ইস্কুলে গিয়ে,
কতশত রাখি বাঁধলাম হাতে
মিলেমিশে আজ সকলের সাথে।
মহামিলনের মহাউৎসবে
শামিল হয়েছি ভাই-বোন সবে,
মিলেমিশে গেয়ে মিলনের গান
মহাআনন্দেতে ভরে যায় প্রাণ।

সারাদিন কত ছোটাছুটি
আনন্দেতে করি লুটোপুটি,
তুলোর সুতো ব্রেসলেট।
সাথে আছে দুটো চকোলেট।
মন ভালো হলো উৎসব শেষে
ঘরে ফিরলাম মোরা হেসে হেসে,
নানান ছবি চোখে ওঠে ভেসে
আজ মিলনের দিন রবিঠাকুরের দেশে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৪

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো শারদীয়া

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - বিপরিণাম
সুমিত্রা ঘোষ - চিরন্তন কাহিনি

উপন্যাসোপম বড় গল্প

প্রবাল চক্রবর্তী - সম্ভবামি

গল্প

এষা দে, শেখর বসু, রমানাথ রায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
সন্দীপ চক্রবর্তী, গোপাল চক্রবর্তী, বিরাজনারায়ণ রায়

প্রবন্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস, অমলেশ মিশ্র, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ,
রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন নিয়োগী,
রবিরঞ্জন সেন, রজত রায়, জিষ্ণু বসু, অর্ণব নাগ, দেবীপ্রসাদ রায়,
পিনাকপাণি ঘোষ, রজত পাল, ড. সীতানাথ গোস্বামী, বিজয় আঢ্য

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
21 August - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।